উৎস মানুষ

৩৭ বর্ষ • ২য় সংখ্যা • এপ্রিল-জুন ২০১৭

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
পরিবেশকর্মীর ভাবনাচিন্তা	ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ	৩
উইকিপিডিয়া ও বাঙালি	সুগত সিংহ	৫
কিছু খুব জানা কথা	প্রবীর ভট্টাচার্য	৮
চিকিৎসা পারদর্শিতা	গৌতম মিস্ত্রি	১০
পূর্ব কলকাতার জলাভূমি	ধ্রুবা দাশগুপ্ত	১৫
চা-বাগান শ্রমিক		২০
চিলগাড্ডা থেকে চাংশা	ভবানীপ্রসাদ সাহু	২০
আকুপাংচার বিতর্ক		২৫
নিবেদিতা বিতর্ক		২৮
বইমেলায় আমরা		৩২

সম্পাদক

সমীরকুমার ঘোষ

রেজিস্টার্ড অফিস: বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪

কার্যালয়

খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন

বি ৪ ও ৫, এস- ৩, নারায়ণপুর

পোঃ (আর গোপালপুর) কলকাতা- ৭০০১৩৬

ফোন: ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৬৫

ওয়েবসাইট: www.utsamanush.com

ই মেল: utsamanush1980@gmail.com

থাকুক ধর্ম মরুক মানুষ

পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে, তার সব কটাতেই খুব ভাল ভাল কথা আছে– সব মানুষ ঈশ্বরের সন্তান, সবাই সমান, সবাইকে ভালোবাসো ইত্যাদি ইত্যাদি। ধর্ম নিয়ে কিছু বলতে গেলেই ধর্মপ্রাণ গুরু-নেতারা এইসব যুক্তিগুলোকে এগিয়ে দেন। বলেন, কিছু লোক ধর্মের নামে যথেচ্ছাচার করে, তাই বলে ধর্মকে খারাপ বলা যায় না। আসলে তা মহান। ওঁরা বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের উদাহরণও টানেন। শুনলে মনে হয়, কথাটা সত্যিই। তবে যে কথাটা ওঁরা বলেন না, তা হল, সব ধর্মই সমান, কেউ কেউ বেশি সমান। মানে সব ধর্ম ভাল, আমারটা সবচেয়ে ভাল। এমন কোনো ধর্মীয় নেতা, গুরু কি মিলবে, যিনি বলবেন– না ভাই, আমার ধর্মের চেয়ে তোমারটা ঢের ভাল? মিলবে না। মিলতে পারে না। সে তিনি রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দই হোন বা হজরত কিংবা সেন্ট জন, জোসেফ।

হিন্দুদের আবার প্রাচীনতার ভারি অহঙ্কার। যেন যা কিছু প্রাচীন, তাই ভাল। তাদের ব্যাখ্যা ধর্ম আর রিলিজিয়ন এক নয়। ধর্মের অর্থ আরও গভীর ব্যঞ্জনাময়। ধর্ম মানে যা ধারণ করে থাকে। নিশ্চয়ই থাকে। একদল লোককে অন্য একদল লোকের থেকে আলাদা করে ধারণ করে থাকে।

ধর্ম ব্যাপারটাকেই নির্মূল করা হোক, এই দাবি কেউ তোলার হিম্মত কেউ দেখান না। এক সময় চার্বাকরা তুলেছিলেন। পরে কার্ল মার্কস, লেনিনরাও। কালের ফেরে তাঁরা ইতিহাসের অন্ধকূপে। 'আ ক্রিটিক অভ হেগেলস ফিলসফি অভ রাইট'-এর মুখবন্ধে মার্কস লিখেছিলেন, 'রিলিজিয়ন ইজ দ্য সাই অভ দ্য অপপ্রেসড ক্রিয়েচার, দ্য ফিলিংস অভ আ হার্টলেস ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড দ্য স্পিরিট অভ কন্ডিশনস হুইচ আর আনস্পিরিচুয়াল। ইট ইজ দ্য ওপিয়াম অভ দ্য পিপ্‌ল।' আমাদের দেশে মার্কসবাদী তথা বামপন্থীরা ৩৫ বছর ক্ষমতায় থেকেও ধর্মের বিরুদ্ধে রা কাড়েন নি, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পথ মাড়ান নি। উল্টে মাও সে তুংয়ের জলের সঙ্গে মাছের মতো মিশে থাকার তত্ত্ব আওড়ে পাড়ায় পাড়ায় পুজো কমিটিতে ভিড়ে গেলেন। কর্মকর্তা হলেন। কেউ একধাপ এগিয়ে ছুটলেন তারাপীঠে।

ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নেতারা জানেন, ধর্ম এমন সহজ

এক উপকরণ, যা দিয়ে অতি সহজেই অল্প সময়ে বেশি সংখ্যক লোককে যেমন খুশি চালানো যায়। কারণ যে শিক্ষা চেতনা আনে, সেই শিক্ষা আমরা পাই না, বিপ্লব তো অনেক দূরের কথা। তাই ধর্মকে যে কোনো শর্তে তাঁরা বাঁচিয়ে রাখতে চান। যে দু-চারজন এর বিরুদ্ধাচারণ করেন, মুক্ত চিন্তার কথা বলেন, তাঁদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও হয়। বাংলাদেশে একের পর এক ব্লগারকে হত্যা করা হচ্ছে। ভারতও পিছিয়ে নেই। দাভোলকার, পানেসররা প্রাণ দিয়েছেন। গত ১৫ মার্চ কোয়েম্বাটোরে এইচ ফারুক নামে ৩১ বছরের এক মুসলিম যুবক এবং ১৪ এপ্রিল পাকিস্তানে সাংবাদিকতার ছাত্র মাশল খাঁকে কে খুন করা হয়েছে। অপরাধ ওঁরা ধর্মের বিরুদ্ধে ফেসবুকে লেখালিখি করত।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বাম-ডান সব রাজনৈতিক দলেরই ধর্ম নিয়ে নিরপেক্ষতার ভণ্ডামীর সঙ্গে পরিচিত। এতদিন তাতে মুক্তচিন্তার মানুষদের বড় ধরনের বিপদে পড়তে হয়নি। বিজেপির উত্থানে অশনি সঙ্কেত। ধর্মীয় মৌলবাদ তা সে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান যাই হোক, একই রকম বিপজ্জনক। যে চৈতন্য অহিংসার পূজারি, তাঁর হত্যারহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে খুন হয়ে যান গবেষক জয়দেব মুখোপাধ্যায়। বিবেকানন্দ আমেরিকায় গিয়ে যে বেদান্ত দর্শনের ধ্বজা উড়িয়েছিলেন, সেই বেদান্ত দর্শনের পথিকৃৎ শঙ্করাচার্য এই মায়াময় জগতের বহু বিরুদ্ধবাদীকে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দিতেন। তাঁর সঙ্গে বিরাট ঠেঙাড়ে বাহিনী থাকত। যে হিন্দুরা মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে হিন্দু মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়ার অভিযোগ তোলে, তারাই বৌদ্ধদের সঙ্ঘ, স্তূপ গুঁড়িয়ে তার ওপর মন্দির খাড়া করেছিল। পিটিয়ে দেশছাড়া করে দিয়েছিল। পরিত্যক্ত অজিণ্ঠা, মানে অজন্তা গুহা তারই সাক্ষ্য দেয়। তাই তালিবান, আইএস-দের চেয়ে বজরঙ্গী বা আরএসএস-রা কোনো অংশে কম নয়, এটা মাথায় রাখতে হবে। দস্যু রত্নাকর থেকে বাল্মীকি হয়ে ওঠার কাহিনীর নির্দোষ উদাহরণ টেনে বেচারি রাখি সাওন্ত হুমকির পাশাপাশি পুলিসি হয়রানির চক্করে পড়েছেন। আইএস জঙ্গিদের নিষ্ঠুরতার কাহিনী রোজ পড়ি। প্রয়োজনে হিন্দুরাও কম যায় না, তার প্রমাণ দুই শিশু সন্তানসহ পাদরি গ্রাহাম স্টেনকে পুড়িয়ে মারা। তাই মুক্তচিন্তার মানুষদের একজোট হয়ে পথ বার করতে হবে। আইএস-কে তো ঠেকাতেই হবে, আরএসএস, বজরংদেরও। ধর্মকে সমূলে বিনাশ না করা অবধি ধর্ম নিয়ে খেলা চলবেই। আওয়াজ তুলতে হবে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান— কোনো ধর্ম চাই না। প্রাণী জগতে ধর্ম বলে কিছুর স্থান নেই। পশুদের যেমন পশুধর্ম, মানবতাই হোক মানুষের ধর্ম।

ক্রমশ ক্রমশ শিক্ষিত মানুষদের মধ্যেও মেরুকরণ শুরু হয়ে গিয়েছে। জনপ্রিয় লেখক চেতন ভগত, 'হোয়াই উই নিড আ রাম টেম্পল ইন অযোধ্যা' শিরোনামে টাইমস অভ ইন্ডিয়ায় প্রবন্ধ লিখছেন। এটাও কম দুশ্চিন্তার নয়।

গত বছরই বইমেলায় বাংলাদেশের কয়েকজন এসেছিলেন উৎস মানুষের স্টলে বই কিনতে। ওঁরা মুক্তচিন্তার পক্ষে লড়াই চালাচ্ছেন, নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে। জানালেন, জানতে পারলেই মৌলবাদীরা প্রাণে মেরে ফেলবে। ওঁদের মুখ থেকেই শুনেছিলাম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির কথা। অথচ এই বাংলাদেশেই একসময় বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন হয়েছিল!

বিজ্ঞান-প্রযুক্তির দৌলতে আমরা নাকি প্রচুর এগিয়ে গিয়েছি! গ্রামেগঞ্জেও পৌঁছে গিয়েছে মোবাইল, ইন্টারনেট, ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ। আসল চিত্রটা কিছু কিছু খবর থেকেই উঠে আসে। ৮ এপ্রিলের খবর— 'সিদ্ধির বাসনায় মাকে বলি তান্ত্রিক ছেলের'। পুরুলিয়ার বরাবাজার থানার বামু গ্রামের ঘটনা। চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে সন্ন্যাস নেন গ্রামবাংলার বহু মানুষ। কয়েকটা দিন নিদারুণ কষ্ট স্বীকার করেন। কেউ জিভ ফোঁড়েন। এঁরা শিবের ভক্ত। মূলত হতদরিদ্র। মোক্ষলাভের জন্য ধনীদের মানত করতে হয় না, সন্ন্যাস নিতে হয় না। শিব এসে এমনিতেই ওদের ধরা দেন। বাবার মহিমা দেখানোর জন্য উঁচু থেকে বঁটিঝাঁপ, কাঁটাঝাঁপ ইত্যাদির প্রচলন আছে। লাফিয়ে পড়েও অক্ষত থাকাটাই মহিমার প্রকাশ। কিন্তু এই লাফানোর মধ্যে মহিমা নয়, আসলে থাকে কৌশল। পোড় খাওয়া লোক না হলে যা হতে পারে, তাই হয়েছে মন্দিরবাজারে। গাববেড়িয়ার ক্লাস নাইনে পড়া মাতৃহারা সুবীরব্রত (১৩) বাবা অরূপ পালের সঙ্গে সন্ন্যাস নিত। ১২ এপ্রিল বসেছিল ঝাঁপের মেলা। ১২ ফুট উঁচু মাচা থেকে ঝাঁপ দেয় সুবীরব্রত। মাটিতে পড়েই জ্ঞান হারায়। স্থানীয় হাতুড়ে সামলাতে পারেনি। নিয়ে যাওয়া হয় এক নার্সিংহোমে। মারা যায় সে। অন্যদিকে, পাথরপ্রতিমার কুঁয়েমুড়ির গঙ্গারঘাটেও বসেছিল ঝাঁপের মেলা। সন্ন্যাসী আনন্দ মাঝি ১২ ফুট ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন ত্রিশূলের ওপর। বেকায়দায় পড়ে পেট ফুঁড়ে ঢুকে যায় ত্রিশূল। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু। বাবা কোনো ভক্তকেই বাঁচাতে পারেন নি। এ সব নিয়ে সচেতনতায় কোনো রাজনৈতিক দল বা গরিবের মা-বাপও এগিয়ে আসেন না। কারণ ধর্ম। ধর্ম গেলে ওরা খাবেটা কী! গরিব মানুষগুলো হানাহানিতে বা অন্যভাবে মরতেই থাকবে।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা

একজন পরিবেশকর্মীর ভাবনাচিন্তা

ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ

একটি জানা গল্প আবার বলতে ইচ্ছে করছে। গল্পটা আফ্রিকা মহাদেশের। বান্টু অঞ্চলের। একজন নৃতত্ত্ববিদ একটা মজার খেলা আমদানী করলেন। একটা গাছের ডালে একঝুড়ি আপেল ঝুলিয়ে দিলেন। দূরে একটা দাগ দিলেন। দাগ ধরে সাতটি বাচ্চা দাঁড়িয়ে আছে। দৌড়বে বলে। শর্ত হল, যে আগে পৌঁছতে পারবে সব কটা আপেল তার। সাহেবের যে দেশে জন্ম সেখানে বাচ্চাদের এরকম খেলা দিলে তারা হয়ত হৈ হৈ করে দৌড়াত এবং একজন প্রথমে ছুঁতো। সবকটা আপেল সেই পেত। এটা-ই তো খেলার শর্ত। কিন্তু এই বাচ্চারা যে দেশে জন্মেছে তাদের উচিৎ অনুচিত বোধ একেবারেই আলাদা। বাচ্চাগুলি সকলে মিলে হাত ধরাধরি করে একই সাথে ঝুড়ির কাছে হাজির হলো। সাহেব তো অবাক— শুনি নাই কভু, দেখি নাই কভু অবস্থা। জানতে চাইলেন এরকম তারা কেন করতে গেল। উবন্তু। উত্তর দিল সবাই মিলে। বুঝিয়ে দিল সাহেবকে উবন্তু কথাটার মানে, উবন্তু বলতে কি বোঝায়। তাদের কথা এই যে যদি আর সকলে দুঃখ পায় তবে একজন কি করে আনন্দ পাবে। সবাই একসাথে ভোগ করতে না পারলে সেটা আনন্দ নয়। সবাই আছে তাই আমি আছি— এই হল ওই বাচ্চাগুলির শিক্ষা। এত অল্প বয়সে ওরা এটা জানে যা আজকের এগিয়ে থাকা, স্মার্ট, বিজ্ঞানমনস্ক সভ্যতায় আতিপাঁতি করে খুঁজলেও কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না বাচ্চাদের সহজাত সদ্ভাবনায়। এই শিক্ষার অস্তিত্ব আধুনিকতায় আর মোবাইল অ্যাপে হারিয়ে গেছে। একেবারে গোড়া ধরে নাড়া দেয় আজকের মূল্যবোধে, জীবন চরিতে, জোটবদ্ধ হওয়ার ফাঁকা আওয়াজে আর মৌলিক ভাল-মন্দ বোধে।

আবার ভাবি, এই বাচ্চাগুলি যদি পারে তবে আমাদেরও একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? প্রথমে শুরু করি প্রকৃতি তথা প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে সমাজের সম্পর্ক নিয়ে অধ্যয়নের বিজ্ঞান। খুবই জরুরী বিষয়বস্তু। এটাও ঠিক যে কাজটা সহজ হবে না। এর অনেকটা জ্ঞানই সাধারণ মানুষ, চাষি, জেলে আর বনবাসীদের সহজাত। আমাদের চিনতে অসুবিধা হয় কারণ মানুষ মাত্রই নানান ছুঁৎমার্গের শিকার হয়ে থাকেন। অনেকেই সারাজীবন কাটিয়ে দেন তাই নিয়ে। কোনও প্রয়োজন বোধ করেন না তাকে যাচাই করার বা তা থেকে মুক্ত হবার। সবচেয়ে প্রচলিত ছুঁৎমার্গ হল গায়ের রঙ নিয়ে। সাদারা এগিয়ে, কালোরা পিছিয়ে। বিভিন্ন স্তরের তীব্রতা। এই বর্ণবৈষম্য মানুষের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং লজ্জাজনক পরিচালক। তার মানে এই নয় যে প্রত্যেক সাদা চামড়ার মানুষ কালো দেখলে নাক সিঁটকোতে থাকেন তবুও বহু দেশে বহু মানুষের অন্তরে আজও বর্ণবৈষম্যের বসবাস আজও বজায় আছে।

আমার ভাবনা বর্ণবৈষম্য ঘটিত ছুঁৎমার্গ নিয়ে নয়। আমার বোঝার চেষ্টা মানুষের চৈতন্যর বিকাশ নিয়ে। চেতনার জগতে এক অচর্চিত ঘাটতি নিয়ে। চেতনার জগতে এক অদ্ভুত ছুঁৎমার্গ নিয়ে আছে তথাকথিত সমাজের এগিয়ে থাকা অংশ। সুবিধা ভোগী অংশ। ভোগসুখের উপর নিশ্চিন্ত দখলদারি উপভোগ করা অংশ। এই নির্লজ্জ এবং নির্মম বৈষম্যবোধ সযত্নে সঞ্চিত রেখেছেন আধুনিক ইতিহাসের এক কলঙ্কের বোঝা হয়ে। চেতনার জগতের এই ছুঁৎমার্গ কিছুতেই প্রকৃতিকে যাঁরা জীবনবোধ দিয়ে চলেন, বাঁচার তাগিদে সরাসরি আদানপ্রদান করেন প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে মিলেমিশে জীবনীশক্তি খোঁজেন, যেমন জেলে, চাষি, বা যাঁরা বনে-বাদাড়ে খুঁটে খেয়ে বেঁচে থাকেন,

যাঁরা তাঁদেরই স্বার্থে প্রকৃতির নানান গঠনকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখেন তাঁরাই হলেন মানুষের মাঝে জ্ঞানের বৃহত্তম খনি। আমরা কোনোদিনও সেই স্বীকৃতি বা উপযুক্ত মাত্রায় বৈজ্ঞানিকের সম্মান দিতে পারলাম না। অথচ যাঁদের ওই বিজ্ঞান-এর উপর একটি জলজ্যান্ত বিভাগ আছে— তার নাম ইকলজি। এর বাংলা যা আছে তাতে মন ভরে না। তাই ইকলজিকে বাংলায় আপন করে নিলে আপদ চোকে। অসুবিধাই বা কীসে! ফলিডলের বাংলা হয় না। পুলিশের বাংলা হয় না। ওগুলোই বাংলা। তেমনি ইকলজিকে বাংলা বলে ধরে নিলে কোনও ব্যাকরণগত মর্যাদা খোয়া যাবে না।

প্রায় বছর দশেক আগে কোলাম্বিয়া দেশে একটি জঙ্গল দেখতে গিয়েছিলাম নানান খ্যাতনামা ইকলজি তথা পরিবেশ বা বনজঙ্গল বিশেষজ্ঞদের সাথে। বিশাল জঙ্গল। অসামান্য তার জীববৈচিত্র্যের আধার। একজন প্রৌঢ় একমনে আমাদের সব বুঝিয়ে দিলেন। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী। সহকারি বা সহকর্মী। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আমরা শুনছিলাম। একজন সাহেব প্রশ্ন করলেন যে প্রৌঢ় ইকলজি কাকে বলে জানেন কি না? প্রৌঢ় উত্তর দিলেন যে তিনি জানেন না। আবার প্রশ্ন। ইকোসিস্টেম ম্যানেজমেন্ট বলতে উনি কি বোঝেন। একটু বিরক্ত হয়ে প্রৌঢ় উত্তর দিয়েছিলেন যে ওঁদের ওসব না জানলেও চলে তবে, প্রশ্নকর্তা মনে হয় সেমিনারে যান সেখানে এসব জানতে লাগে। মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল আমার মগজের কাজকর্ম। যাঁরা জানেন, তাঁরা জানেন না, জানার প্রয়োজনও বোধ করেন না যে, আমরা তাদের জ্ঞানটিকে কি নাম দিয়েছি। শুধু নাম দিয়েছি তাই না, শুধু নাম দিয়েছি বলেই পিতৃত্বের অধিকার রাখাও কি বিকৃত প্রচেষ্টা।

এখানেই গোলমাল বা এখান থেকেই আবার শুরু। নতুন পরিবেশচর্চার বুনিয়াদ গড়ার প্রয়োজন আছে। কাজটা কার আমার জানা নেই কিন্তু কয়েকজন মিলে শুরু করলে কোনও কৌলিন্য হারাবে বলে মনে হয় না।

এই পর্যায়ে আমরা কয়েকটা সূত্র একত্র করতে পারি। ছড়ানো ছেটানো বোধগুলি এক জায়গায় করতে পারলে এগোতে সুবিধা হবে। এই সূত্রগুলি কোনও মতেই কোনো তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসাবে পরিবেশিত হচ্ছে না। এখনকার ইচ্ছে এইটুকুই যে আসুন সবাই মিলে ভাবি। ভেবে একটা সূত্র-সমগ্র খাড়া করি; তাই নিয়ে ছড়িয়ে পড়ি। এইটুকু মাথায় নিয়ে নিম্নে লিখিত সূত্রগুলি জড়ো করা হয়েছে। মানা-না মানা, ঠিক-ভুল এ সমস্ত বিতর্ক যদি শুরু হয় তবেই লেখাটা কাজে দিয়েছে মনে হবে।

প্রথম সূত্রঞ্জ প্রকৃতি তার নিজস্ব নিয়মে চলে। মানুষ জীবজন্তু বা জলা-জঙ্গল বাঁচল কি শেষ হয়ে গেল, এ নিয়ে প্রকৃতির সামান্যতম কোনও আঁচড় পড়ে না।

> “অসামান্য জ্ঞানী-গুণী লোকে ঠাসা আমাদের গ্রাম, আমাদের আদিবাসী সমাজ, তাঁদের কাছে আমরা হাজির হতে পারি নি, তাঁদের জ্ঞানের বিস্তারের খোঁজে। কেবল সাহেবদের লেখা বই আর তাদের দেওয়া সূত্র দুলে দুলে মুখস্থ করেছি।”

দ্বিতীয় সূত্রঞ্জ পৃথিবীতে যত ঘটে বা ঘটবে তার কোনও কিছুই নিশ্চিত নয়। বিজ্ঞান এখন এ কথাই বলে।

তৃতীয় সূত্রঞ্জ অধিকাংশ মানুষকে সহ্য শক্তি বাড়াতে বা কষ্টসহিষ্ণু হতে বলে উষ্ণায়নের সমস্যার যে প্রতিবিধান দেওয়া হচ্ছে সেটা অচল। বিত্তবানদের জীবনধারা না পাল্টালে আবহাওয়ায় দুর্যোগ বেড়েই যাবে। পৃথিবী মানুষের জন্য আর বাসযোগ্য থাকবে না।

চতুর্থ সূত্রঞ্জ উষ্ণায়ন নয়, আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমস্যা হল ক্রমশ আরো কম মানুষের কাছে আরও বেশি পরিমাণে সম্পদের মালিকানা কেন্দ্রীভূত হওয়া।

পঞ্চম সূত্রঞ্জ কি করে সুস্থভাবে, অনেক ক্ষতি না করে শান্তিতে বেঁচে থাকতে হয় তা মানুষের অজানা নয়। কিছু লোকের সীমাহীন লোভের তাড়নায় বাকি সকলের জীবন আজ অন্তিম যাত্রায়। তাই আজকের জয়জয়াকার হল তিনটি শাণিত অস্ত্রেরঞ্জ ক) মিথ্যা কথা, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। খ) ন্যায্য অধিকার চাইলে ভয় দেখানো। গ) অলীক জীবনের লোভ দেখিয়ে বিপথগামী করা।

মাঝে মাঝে অবাক লাগে যে পরিবেশচর্চার কোনওরকম মৌলক সূত্র আমাদের দেশে যার কোনও অভাব নেই, তার সন্ধান কখনো বিদ্বজ্জন খুঁজে পেলেন না। অথচ নিঃসন্দেহে অসামান্য জ্ঞানী-গুণী লোকে ঠাসা আমাদের গ্রাম, আমাদের

আদিবাসী সমাজ, তাঁদের কাছে আমরা হাজির হতে পারি নি, তাঁদের জ্ঞানের বিস্তারের খোঁজে। কেবল সাহেবদের লেখা বই আর তাদের দেওয়া সূত্র দুলে দুলে মুখস্থ করেছি। বড় চাকরি বা উপদেষ্টা হতে এই আত্মসম্মানহীন মনোভাব কোনও বাধার কারণও হয় নি।

আমাদের ব্যাপার আমরাই বোঝার চেষ্টা করতে শুরু করি। প্রয়োজনীয় সূত্র আগে নিজেরা লিখি তারপর কার সাথে মিলল বা না মিলল দেখা যাবে। মিললে ভাল না মিললেও কোনও ক্ষতি নেই। ওনারা আমাদের থেকে প্রয়োজনে লিখে নেবেন।

পৃথিবীর বুকের উপর ৭০০ কোটি মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। বলাবাহুল্য এই অসংখ্য মানুষের বেঁচে থাকার ব্যবস্থা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে চলেছে। এই অবস্থায় একজন ব্যক্তির নিজস্ব স্বাধীনতা বলতে কি বোঝায় তা সহজে বলা যায় না। রাইন নদীর ধারে দুর্গের মালিকানা বা পাহাড়ের গুহায় বৈরাগ্যের খোঁজে বসে থাকা সন্ন্যাসী--- এঁরা কেউই তেমনভাবে জীবনের লক্ষ্য আর স্পষ্ট করেন না। বরঞ্চ গুরুত্ব পাচ্ছে একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকার প্রয়োজনীয়তা।

এহেন অবস্থায় এই সামান্য লেখা পড়ে দলে দলে মানুষ দুনিয়া পাল্টানোর কাজে নেমে পড়বেন, এরকম কোনও সম্ভাবনার সামান্যতম আশাতে এই লেখা হয় নি। তবু যদি হাতে গোনা ক'জনে একত্র হওয়া যায়, তাই বা খারাপ কি? আর সেই ক'জনের মনে রাখার বা মেনে চলার জন্য দুটো কথা বলে শেষ করা যায়।

প্রথমত উবস্তু — সবাই আছে বলে আমি আছি।

দ্বিতীয়ত — মনে মুখে এক হতে সচেষ্ট থাকা।

আশা করতে দোষ কি!

উমা

উইকিপিডিয়া ও বাঙালির ইন্টেলেকচুয়াল ডিগবাজি

সুগত সিংহ

দ্বিতীয় ও শেষ কিস্তি

উইকিপিডিয়ার এই যুগান্তকারী ভূমিকা সম্পর্কে বাঙালিদের মধ্যে যতটা হওয়া উচিত ছিল ততটা উৎসাহ চোখে পড়ছে না। আমরা হরবখত উইকিপিডিয়ার সাহায্য নিচ্ছি বটে কিন্তু মূল প্রক্রিয়াটায় অংশ নিচ্ছি না। এই উদ্যোগের অভাব আসলে চেতনার অভাব থেকে জাত। এই অজ্ঞানতা যে কতটা গভীর তা কয়েকটি উদাহরণের দিকে তাকালে বোঝা যাবে। উইকিপিডিয়ায় ইংরেজি আর্টিকেল আছে ৫২ লক্ষের বেশি। সুইডিশ এবং সেবুয়ানো (Cebuano) ভাষায় আছে ২০ লক্ষের বেশি। জার্মান, ফ্রেঞ্চ ১৫ লাখের বেশি। ডাচ, ইতালিয়ান, রাশিয়ান, স্প্যানিশ, পোলিশ এবং ওয়ারে ওয়ারায় (Waray-Waray) প্রতিটিতে আছে ১০ লাখের বেশি। সেবুয়ানো এবং ওয়ারে ওয়ারায় ফিলিপিন্সের দুটো আঞ্চলিক ভাষা। লোকসংখ্যা যথাক্রমে দু কোটি এবং ২৬ লক্ষ। এই হিসেবটা এখানে দেওয়ার কারণ, কোন ভাষাগোষ্ঠীতে কত লোক কথা বলেন এবং সেই ভাষায় কত আর্টিকেল আছে তার ভিত্তিতে উইকিপিডিয়া একটি সূচক তৈরি করেছে। এর মাধ্যমে কোন ভাষার লোকেরা উইকিপিডিয়ায় কতটা সক্রিয় তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। আমাদের উপমহাদেশে আগস্ট ২০১৬ অবধি সেই পরিসংখ্যানটি এইরকম ঃ

	লোকসংখ্যা	আর্টিকেল সংখ্যা
হিন্দি	৫৫০০০০০০০	১১০৯৫৪৮
উর্দু	৬০০০০০০০	১০৭৮৬৭
তামিল	৬৬০০০০০০	৮৯৫৮১
নেপালি	১৬০০০০০০	৭২৭৪৬
তেলুগু	৮০০০০০০০	৬৫২২৮
মালয়ালাম	৩৭০০০০০০	৪৫২৮০
মারাঠি	৯০০০০০০০	৪৫১৪১
বাংলা	২৩০০০০০০০	৪৪,০২৯

উইকিপিডিয়ায় আমাদের টপকে যে ভাষাগুলি বেরিয়ে গেছে, একমাত্র হিন্দি ছাড়া তাদের জনসংখ্যা বাংলার অর্ধেকেরও কম। পূর্ব ইউরোপ এবং সেন্ট্রাল এশিয়ার হিসেব নিলে বাংলার দৈন্য দেখে আরও লজ্জা হবে।

	লোকসংখ্যা	আর্টিকেল সংখ্যা
ইউক্রেনিয়ান	৪৫০০০০০০	৬৫০৩৯২
সার্বো ক্রোশিয়ান	২৩০০০০০০	৪৩৫০৯৭
হাঙ্গারিয়ান	১৫০০০০০০	৩৯৪৯১৩
রুমানিয়ান	২৮০০০০০০	৩৭১৮৮৮
চেক	১২০০০০০০	৩৬২২৭২
সার্বিয়ান	১২০০০০০০	৩৩৮২১৭
কাজাখ	১২০০০০০০	২২০৮৪৩
বুলগেরিয়ান	১২০০০০০০	২২০৪৬৪
স্লোভাক	৭০০০০০০	২১৪১৪৮
আর্মেনিয়ান	৫৫০০০০০	২০৭০২০
লিথুয়ানিয়ান	৩০০০০০০	১৭৯২৫৭
ক্রোশিয়ান	৬২০০০০০	১৬৮২৩৯
স্লোভেনিয়ান	২৫০০০০০	১৫৩০২৫
এস্তোনিয়াম	১১০০০০০	১৪৮৯৬৮
চেচেন	১৪০০০০০	১৪৭৮৫৬
উজবেক	২৩৫০০০০০	১২৮৮০৯
বেলোরুশিয়ান	৬৫০০০০০	১২০৪১৪
জর্জিয়ান	৪৩০০০০০	১০৬৫২০
ল্যাটভিয়ান	১৭৫০০০০	৭২০২৯
তাতার	৮০০০০০০	৬৯৬৬৭
বসনিয়ান	৩০০০০০০	৬৯৯৭৫

এই অঞ্চলের হিসেবটা নিলাম কারণ, ভাষাগুলির জনসংখ্যা বাংলার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশ এবং কমিউনিজমের পতন, যুদ্ধ, জাতিদাঙ্গায় তারা টালমাটাল হয়ে গেছে। তবু তাদের জ্ঞানচর্চা দুর্বার। আমাদের ওপর তেমন তো কোনও ঝড়ই যায় নি। তবে কি ৩৪ বছর ধরে মধ্যমেধার সবজান্তা হামবড়া আর তারপর এই তৃণমূলী অ্যান্টিক্লাইম্যাক্সে আমাদের পুরো 'থট ব্লক' হয়ে গেল? বাংলায় এত লোক কথা বলে কিন্তু তাদের উপস্থিতি এত কম কেন, তাই নিয়ে উইকিপিডিয়ানরা কয়েকটি ফোরামে তাদের ব্যথা এবং চিন্তা প্রকাশ করেছেন।[২] অথচ আমাদের হুঁশ নেই। ছোট ছোট দেশগুলি কেন উইকিপিডিয়াকে আঁকড়ে ধরেছে? কারণ যে ভাষায় লোকসংখ্যা কম, সেখানে এনসাইক্লোপিডিয়া ছেপে খরচ তোলা অসম্ভব। উইকিপিডিয়া তাদের কাছে একটা আশীর্বাদ হিসেবে এসেছে। বিশ্বকোষ ছাড়া যে কোনও জাত এগোতে পারে না, তা নেপাল ও তাতার জাতির লোকেরাও বুঝতে পেরেছে। আমরা বুঝছি না। অথচ আমরা নাকি শিক্ষা সংস্কৃতিতে এগিয়ে থাকা জাত! বাংলায় আজ পর্যন্ত একটা ঠিকঠাক বিশ্বকোষ হল না। হবেও না। প্রকাশকদের আর্থিক সঙ্গতি নেই, বাঙালির ক্রয়ক্ষমতা নেই, বুদ্ধিজীবীদের সে দম নেই। প্রথমত তাঁদের লেখার ওপর কেউ কলম চালিয়ে দিলে অহংয়ে (ইগোয়) লাগবে। দ্বিতীয়ত, তাঁরা টাকা এবং নাম ছাড়া এক বিন্দু নড়ে বসবেন না। উইকিপিডিয়ায় কোনওটাই নেই। তা যেন ডেলফি বা কোনারকের মন্দিরের মতো। কারা বানিয়েছিল জানা যায় না।

উইকিপিডিয়ায় টাকাপয়সার প্রসঙ্গটি কীরকম স্পর্শকাতর একটি উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। ২০০২ সালে খরচা তোলার জন্য উদ্যোক্তারা উইকিপিডিয়ায় বিজ্ঞাপন নেওয়ার প্রস্তাব দেন। মুহূর্তে স্প্যানিশ উইকিপিডিয়া সমস্ত আর্টিকেল তুলে নিয়ে Encyclopedia Libre নামে আরেকটি সাইট বানায়। তারা ঠেস দিয়ে বলেছিল, উইকিপিডিয়া আর Wikipedia নয়, Wikipaidia হতে চলেছে। উইকিপিডিয়া ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। এক বছর ধরে আবেদন, নিবেদন, ক্ষমা চাওয়ার পর স্প্যানিশ সেকশনটিকে ফিরিয়ে আনা গিয়েছিল। তারপর থেকে উইকিপিডিয়ায় বাণিজ্যীকরণ (কমার্শিয়ালাইজেশন) প্রসঙ্গ মেট্রোর থার্ড রেল হিসেবে বিবেচিত হয়। ওটা ছুঁলেই উইকিপিডিয়ার মৃত্যু। উইপিকিডিয়া চলে বিভিন্ন সংস্থা এবং ব্যক্তির অনুদানে। মানুষের সমস্ত জ্ঞান সমস্ত মানুষের নাগালে থাকবে এবং তার মধ্যে এক বিন্দু পয়সার গন্ধ থাকবে না, এই আদর্শে তিন কোটির ওপর এডিটর, প্রোগ্রামার, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বুক দিয়ে উইকিপিডিয়াকে আগলে রাখেন।

বাংলায় ৪৪ হাজার নিবন্ধের মধ্যে অধিকাংশই সম্ভব হয়েছে ওপার বাংলার উইকিপিডিয়ানদের জন্য। ওঁরা এ ব্যাপারে অনেক বেশি সচেতন ও আবেগপ্রবণ। ওঁদের হার্দিক চেষ্টা সত্ত্বেও সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি সংক্রান্ত অধিকাংশ বাংলা আর্টিকেল এমন অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে যে, কোনও কাজে আসে না। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারমশাইরা ছাত্রদের একটু পথ দেখালে এগুলো সম্পূর্ণ হয়ে যেতে পারে। অবসরের পর নিজেকে সব প্রয়োজনের বাইরে মনে করে অনেকে বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এঁদের মধ্যে শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার বা অন্যান্য স্পেশালাইজড প্রফেশনের মানুষ আছেন। সারাজীবনের চর্চিত জ্ঞান নিয়ে এই কাজটা করলে তাঁদের শেষ কটা দিন মধুময় হয়ে উঠবে। একদম সাধারণ মানুষের জন্য উইকিপিডিয়ানদের মন্ত্র হল 'be bold'। কোনও তথ্য ঘেঁটে যেতে পারে এই ভয় একদম পাবেন না। উইকির ধন কিছুই যায় না ফেলা।

চাইলেই আগের পাতাটি ফিরিয়ে আনা যায়। অসুবিধে হলে talk বা discussion পেজে গিয়ে অন্যান্য উইকিপিডিয়ানদের থেকে অনলাইন সাহায্য নেওয়া যায়। তবে মূল এডিটিং-এ ঢোকার আগে বা খেলাঘর নামে পেজটিতে ঢুকে একটু এডিটিং এডিটিং খেলে সফ্‌টঅয়্যারটিকে বুঝে নিন। তারপর ইংরেজি উইকিপিডিয়া থেকে বাংলা উইকিপিডিয়ায় অনুবাদ দিয়ে শুরু করতে পারেন। উইকিপিডিয়ানরা কিন্তু আক্ষরিক অনুবাদ পছন্দ করেন না। তাঁরা চান কুকুর এন্ট্রিতে অন্যান্য জরুরি তথ্যের পাশাপাশি ধর্মরাজ যে কুকুরের বেশে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গী হয়েছিলেন এটা ভারতীয় উইকিপিডিয়াগুলোতে জায়গা পাক। মানে উইকিপিডিয়ার যেন একটা আঞ্চলিক আইডেনটিটি থাকে।

উইকিপিডিয়ার গাইডলাইন হল কপিরাইটেড মেটিরিয়াল টুকে দিলে চলবে না। ঘরে বসে কোনও বিরাট তত্ত্ব নামিয়েছেন সেটা প্রচার করা চলবে না। সংবেদনশীল তথ্য হলে খবরের উৎস দিতে হবে। তাড়া তাড়া বই নিয়ে গবেষণা করে পাণ্ডিত্য ফলানোর দরকার নেই। দু দিনে হাঁপিয়ে যাবেন। বরং যদি মনে হয় পাঁচফোড়ন নিয়ে পাঁচ লাইন লিখতে পারেন তো শুরু করে দিন। উইকিপিডিয়া পেজটি stub বা অসম্পূর্ণ হিসেবে দেখাবে। এরপর আসল মজা। দেখবেন যারা পেজটিতে ভিজিট করছেন, তাঁদের কেউ কেউ এক লাইন, দু লাইন যোগ করে চলে যাবেন। এইভাবে মউ জমে জমে পেজটি একদিন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, পাঁচফোড়নের স্বাদ খুলে যাবে। এরকম সাদামাঠাভাবেই উইকিপিডিয়ার অধিকাংশ পেজ শুরু হয়েছে। কারণ উইকিপিডিয়ানরা জানেন, এটা মৌলিক কিছু করার জায়গা নয়। এনসাইক্লোপিডিয়া সংস্কৃতির সৃষ্টি করে না তাকে ধরে রাখে। আমরা বাঙালিরা এইটুকু পারব না? এই সুযোগ হেলায় হারাব? এতটা দেউলে হয়ে গেলাম আমরা?

এই দৈন্যদশার মধ্যেও এপার বাংলার কিছু তরুণ কাজ শুরু করেছেন। উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে উইকি সোর্স নামে একটি ডিজিটাল লাইব্রেরি আছে যেখানে কপিরাইটমুক্ত বই ডিজিটাইজ করে রাখা হয় এবং যে কেউ সেটি বিনামূল্যে দেখতে ও ব্যবহার করতে পারেন। এঁরা দুষ্প্রাপ্য বাংলা বই ডিজিটাইজ করতে শুরু করেছেন। উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশন এবং ইউনেস্কোর যৌথ উদ্যোগে Wiki Loves Monuments নামে একটি ফটো প্রজেক্ট শুরু হয়েছে। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেনান। শখে এবং খেয়ালে পুরনো মন্দির, মসজিদ, ভেঙে পড়া বাড়ির ছবি তোলেন। সেটাকে ব্যক্তিগত সংগ্রহে আবদ্ধ না রেখে উইকিপিডিয়ায় দিলে তা নির্দিষ্টভাবেই নথিভুক্ত হবে ভবিষ্যৎ গবেষণায় কাজে আসবে। সারা পৃথিবী জুড়ে এই কাজ হচ্ছে এবং পশ্চিমবঙ্গও তার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ দুটি-ই বড় কাজ এবং বাংলার সংস্কৃতিকে বাঁচানোর জন্য জরুরি কাজ। কিন্তু এর জন্য দরকার প্রচুর ভলেন্টিয়ার্স এবং সচেতনতা।

আজ থেকে বহু বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্মী পরপীড়কদের জীবনচরিত মাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে। ...আইস আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যতদূর সাধ্য, সে তত দূর করুক; ক্ষুদ্র কীট যোজনব্যাপী দ্বীপ নির্মাণ করে। একের কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে।'[৩] বঙ্কিমচন্দ্র যে ডাক দিয়েছিলেন তা ক্রাউড সোর্সিং ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু তখন টেকনোলজিটা তিনি পান নি। বঙ্কিমচন্দ্র আজকে বেঁচে থাকলে নিশ্চয় উইকিপিডিয়ান হতেন।

সূত্র:

১) http://www.nature.com/nature/journal/v438/n7070/438900a.html

২) The Wikipedia Revolution How a Bunch of Nobodies Created the World's Greatest Encylopedia. Andrew Lih. Aurum Press Limited. Great Britain, 2009. p. 137.

৩) বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।। বঙ্কিম রচনাবলী। সাহিত্য সংসদ। কলকাতা। ১৩৮৪। পৃ.৩৩৭।

পুনশ্চ: উইকিপিডিয়া বাংলায় যোগাযোগের নম্বর-
শান্তনু চন্দ: ৯৮৩০০৮৮৯৯৮

উমা

ভুল, দুঃখিত

গত জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যায় 'জাদুসম্রাট গণপতি ও বাঙালির জাদুচর্চা' বইটির 'দীর্ঘলালিত মিথ্যাচারের যোগ্য জবাব' শীর্ষক সমালোচনাটি লিখেছিলেন তুষার প্রধান। অনবধানে ওঁর নামটি বাদ পড়ে যাওয়ায় আমরা দুঃখিত।

কিছু খুব জানা কথা

প্রবীর ভট্টাচার্য

ঘুম ভাঙে ভোর পাঁচটায়। ঠিক সাড়ে পাঁচটায় সে পৌঁছয় অনুশ্রী পল্লীর ফ্ল্যাটবাড়িতে প্রথম কাজে। সুকান্তপল্লীর নিজের ভাড়াবাড়ি থেকে সেটা ১০ মিনিটের পথ। তারপর একের পর এক সাত বাড়ির কাজ চলে ঝড়ের গতিতে। অনুশ্রীপল্লী থেকে গীতাঞ্জলি পার্ক, সেখান থেকে বৈশাখী।

মেয়েটির বয়স ১৫। নাম সোনিয়া। আমাদের সান্ধ্য স্কুলের ছাত্রী। ছোটখাটো চেহারা। লম্বা ও ওজন দু দিকেই কম।

ছোট থাকার সুবিধাও অনেক। অভিজাত এইসব কলোনিগুলি পাশাপাশি হলেও উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পথ দিয়ে এ পাড়া থেকে ও পাড়ায় যেতে সময় লাগে ১৫-২০ মিনিট বা আধ ঘণ্টা। সোনিয়া যায় পাঁচিল টপকে, গাছ বেয়ে। বিবিরা তাই যথাসময়েই তাকে পায়। কলকাতা যখন ঘুমোয়, তখন এই পঞ্চদশীর আটখানা কাজ এভাবেই শেষ হয়ে যায়।

বয়স কম, কিন্তু এদেশে সোনিয়াদের অভিজ্ঞতা খুব কম হয় না। সোনিয়ার বাবা যক্ষ্মায় ভুগে যখন মারা যান, তখন ওর বয়স ছিল ১০। ছোট ছোট আরও দুটি ভাই, ৪ আর ৬ বছরের। মায়ের পৌরাণিক নাম দ্রৌপদী দেবী। কিন্তু ভাগ্যটা আধুনিক। অসহায় অবস্থায় তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে গিরিডিতে শ্বশুরালয়ে যান। দাদু দীপন দাস, সম্পত্তির অধিকার দিতে হবে এই ভয়ে, নাতি-নাতনি সমেত পুত্রবধূকে মেরে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেন।

দ্রৌপদী ফের কলকাতায় ফিরে পরিবারটি নিয়ে রাস্তায় নেমে আসে।

শুরু হয় সোনিয়ার সংগ্রামের জীবন। সে স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। প্রাথমিক কিছু পাঠও নিয়েছিল। কিন্তু পিতৃবিয়োগের পর পড়া বন্ধ। মায়ের প্রণোদনায় একের পর এক বিবিদের ফাইফরমাস খাটা। ছয়, সাত এবং শেষ পর্যন্ত দশ বাড়ির কাজ। মা দ্রৌপদী জোটালেন কামারহাটি পুরসভার ১০০ দিনের কাজ। খাটনি কম, ফাঁকিও মারা যায়। সোনিয়ার তাতে অবশ্য কোনো লাভ হল না, তার রোজগারেই সংসার চলছে। মায়ের পৌরাণিকতা তার সন্তান সম্পর্কিত লিঙ্গ বৈষম্যে ক্রমে ক্রমে প্রকটিত হয়েছে। সোনিয়া সেই থেকে কাজে যায়, ভাইয়েরা স্কুলে।

সম্প্রতি বি টি রোডের রথতলায়, 'রথ' নামে এক রেস্টুরেন্টে সোনিয়া নতুন কাজ পেয়েছে। মাইনে অনেক। ৪০০০ টাকা। কাজ অনেক— ধোওয়া-মোছা, বিরিয়ানি রেস্টুরেন্টের আগের রাতের খদ্দেরদের উচ্ছিষ্ট থালা ও অন্যান্য বাসনপত্র মাজা। মাঝে মাঝে চড় থাপ্পড় খায়। ঘরে সব দায়িত্ব সামলায়। এখন মায়ের শরীরও নাকি চলে না। তাকে বিশ্রাম দিতে হবে। তার ওপর মা আবার পুত্রগত প্রাণ। সোনিয়া খাটুক--- ছেলেরা পড়ুক। ছেলেদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে দ্রৌপদীদেবী দেশবাড়িতে ক্ষেতি-জমি কেনার কথাও ভাবছেন।

সোনিয়া খাটছে। দিনরাত— ১৫ বছর ধরে খাটছে।

দ্রৌপদী তার টাকা হস্তগত করে দেশে কোনো কাকাকে পাঠায়। ছেলেদের নিয়ে ওখানেই তো তার ভবিষ্যতের ঘর বাড়ি হবে।

সন্ধে হলেই পরিশ্রান্ত-বিধ্বস্ত অথচ হাস্যময়ী সোনিয়া আমাদের স্কুলে রোজ নিয়ম করে আসে। বইখাতা নিয়ে বসে যায় একধারে। গোলগাল মিষ্টি মুখশ্রী। এই সোনিয়া হতভাগ্য এই দেশে পড়ে বড় হতে চায়! দিদিদের সব কথা আগ বাড়িয়ে তাই মানে। কাজের অভ্যাস হয়ে গেছে, তাই, ক্লাসঘরেরও ধুলো ঝাড়ে। এঁটো বাসন ধোয়। বোর্ড মুছে, চক সাজিয়ে রাখে।

দেশের সংবিধানে শিশুর অধিকার বিল নিয়ে লেখা আছে ও আমাদের সরকারের মেনে নেওয়া আছে, ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিটি শিশুকে ঝুঁকিযুক্ত ও শিক্ষাবঞ্চনাকারী কাজ থেকে দূরে রাখার দায়িত্ব সরকারের।

'...State Parties recognize the right of the child to protected from economic exploitation and from performing any work that is likely to

be hazardous or to interfare with the child education...'.[Article - 32]

আইনের কাগজপত্র অনুসারে গৃহপরিচারিকার কাজ কিশোরীকন্যার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এবং অবৈধ। এবং অবশ্যই অধ্যয়ন বিঘ্নকারী কাজ। কাগজপত্রে এ সবের শাস্তির বিধানও রয়েছে।

তবে, কে কাকে শাস্তি দেবে? দ্রৌপদীদেবীর প্রাগৈতিহাসিকতা কি শুধুমাত্র তাঁর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে?

দশ বাড়ি, এক হোটেল, সহস্র পথচারী এবং লক্ষ লক্ষ দেশবাসী কি তা থেকে মুক্ত? আমরা...?

সোনিয়ার মতন আমাদের পাঠকেন্দ্রের বাসন্তী (১৪), কাজল (১৩), মল্লিকা (১৪), অন্নপূর্ণা (১১), নেহা (১০) এবং ১০ বছরের সুইটিও গৃহপরিচারিকার কাজ করে। কাজ না করলে এরা খেতে পাবে না তা জানি। আবার কাজ করলে শিশুর অধিকার লঙ্ঘন হয়, আমরা তাও জানি। সব জেনেশুনে আমরা বিজ্ঞ এবং মহানিদ্রায় ঘুমোই।

কাহিনীগুলো আমাদের সকলেরই জানা। দিন যায়, রাত হয়। ঊষার অন্ধকারে এইসব কিশোরীরা পথে নেমে পড়ে, দলে-দলে, ঝাঁকে-ঝাঁকে।

সোনিয়া চটপটে হলেও মল্লিকা কিন্তু একেবারেই নির্জীব। সে দীর্ঘাঙ্গিনী চতুর্দশী। অপুষ্ট হাড় জিরজিরে শরীরের ওজন ওই বয়সের মানের মাত্র ৬০ শতাংশ। সাত চড়েও সে রা কাড়ে না।

সময়মতো আসা, হাতে হাতে সব কাজ করা, বাংলা-ইংরাজি লেখা ও পড়া, অঙ্ক কষা— এই সবকিছুতেই মল্লিকার অনীহা। যে কোনো সাধারণ প্রশ্নেও মল্লিকা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তবুও কোনো এক দুর্বোধ্য আকাঙ্ক্ষায় সে স্কুলে আসে নিয়মিত। দিদিমণির হাজার চিৎকারেও সে সাড়া দেয় না। উস্কোখুস্কো চুল, যেমন তেমন জামাকাপড় (যা স্কুলের নিয়মবিরুদ্ধ), তবে চোখদুটো সরল, অবিচলিত।

শৈশব থেকে অপুষ্টিতে সম্ভবত তার মস্তিষ্কের বিকাশ হয় নি। মল্লিকা হয়ত স্টান্টেড শিশু। ও সাহস করে কখনো প্রশ্ন করবে না, আপত্তিও করবে না। শুধু মেনে নেবে। মানতে মানতে বাড়তে থাকবে যতদিন এদেশে দুর্বিপাকে সে ছিন্নভিন্ন না হয়।

ছোট বোন অন্নপূর্ণা অবশ্য এর বিপরীত স্বভাবের। চটপটে, কথাবার্তায়ও পটু, দুজনকেই দক্ষিণেশ্বর ভারতীভবন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো গেছে। কিন্তু নিয়মিত ও সঠিক সময়ে স্কুলে না যাওয়ায় সামাজিক অভিভাবক (সোস্যাল গার্জেন) হিসেবে প্রায়শই আমাদেরও কথা শুনতে হয়।

আসলে, সোনিয়ার মতো মল্লিকা সকাল সকাল উঠে কাজে যেতে পারে না। মায়ের সাথে হাতে হাতে ৪-৫ বাড়ির কাজ ছাড়াও মল্লিকা একটি ছোট বাচ্চাকে দেখাশোনার কাজ করে। তবে, সর্বত্র সে নিন্দিত হয়, মার খায়।

সোনিয়ার একটা বিয়ে হয়ে যাবে। সেখানে সে নতুন দাসত্ব হয়ত শুরু করতে পারবে। মল্লিকার সেই দাসত্বের শাস্তিও জুটবে বলে মনে হয় না। এর মধ্যে বিয়ের প্রস্তাব অবশ্য এসেছে। আমাদের সৌভাগ্য যে দুজনেই বিয়ের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে এবং আমাদেরও জানিয়েছে।

আদতে শিশু হলেও ঝাড়খণ্ডের দেহাতি সংস্কৃতিতে সোনিয়া বিয়ের যোগ্য। তার মায়ের মত, এর পর বিয়ে দিলে আর ভাল পাত্র পাওয়া যাবে না। অন্যদিকে মল্লিকার মায়ের কাছে একজন বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে।

এসব টানাপড়েনের মাঝখানে রোজ সন্ধের সময় এই দুই কিশোরী হাজির হয় আনন্দ পাঠশালায়। জানি না আর কতদিন? আমরা তো নিধিরাম সর্দার। কোনো এক ভদ্রস্থ উপার্জন দক্ষতা এদেরকে শেখানোর কোনো ব্যবস্থা এ দেশে নেই।

প্রীতিলতা, মধুমিতাদের গল্প আবার অন্যরকম। সন্ধ্যায় ঘরে পড়বার জায়গা ওদের নেই। কলকাতা এমপাওয়ারমেন্ট ফাউন্ডেশনের সহায়তায় দক্ষিণেশ্বর ভারতীভবন ক্লাসঘরেই তাই শুরু হয়েছে আমাদের 'অধ্যয়ন'-এর ক্লাস।

নিজের ক্লাসের পড়া, বাড়িতে আলো বা জায়গা না থাকা মেয়েরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় এখানে বসে পড়ে। পড়া দেখিয়ে দেবার জন্য দিদিমণি আছেন। দুজন স্বেচ্ছাব্রতী দাদু আছেন। সারদা মঠের বিবেক ক্লাবের মেয়েরাও এখানকার মেয়েদের ছবি আঁকা, নাচ-গান, পড়া দেখানোর কাজে সাহায্য করে।

প্রথমদিনই অধ্যয়নে আসে মধুমিতা ও প্রীতিলতা। একজন ১৫, অন্যজন ১৭। লিভার ক্যানসারে বাবা তারক মৃধার মৃত্যুর পর মা কাবেরী দেবী দক্ষিণেশ্বরে চলে আসেন। সন্দেশখালির খুলনা গ্রামে তারকবাবুর সাইকেল সারানোর দোকান ছিল। দুই মেয়েকে নিয়ে কাবেরী দেবীর সেই ব্যবসা চালানো সম্ভব হল না। সামান্য লেখাপড়া, গ্রামে স্বাস্থ্যসেবিকার কাজ শিখেছেন। এই পুঁজি সম্বল করেই চলে

আসেন দক্ষিণেশ্বরে। রেল রাস্তার ধারে ঝুপড়ি ঘর। আলো নেই। থাকা-শোওয়া-খাওয়া একই জায়গায়। বাথরুম পর্যন্ত নেই। সকালে রেলস্টেশন বা গঙ্গার পাড়। মুশকিল রাত্তিরে। মাসিক ৩-৪ হাজার টাকার আয়ে মেয়েদের টিউশন দেওয়া সম্ভব নয়। অন্ধকার ঘরে দুই বোন কুপি জ্বালিয়ে বা বালি থেকে দক্ষিণেশ্বর আসার চালু রাস্তার ধারে বাতির আলোয় বিদ্যাসাগরী কায়দায় নিজের পড়া করত। এরা দুজনও লড়ছে। হয়ত কোথাও গিয়ে দাঁড়াবে। একজন নাইন, অন্যজন টেন। এদের কাজ জানার জন্য ইংরাজি ও কম্পিউটার শেখাতে হবে। একটু সহায়তা পেলেই এরা পারে। মুশকিল হল, এটাও আমরা সর্বত্র বুঝি না।

কন্যাশিশুদের বেঁচে থাকার অধিকারের গালভরা প্রকল্প আর ভোটলুব্ধ বিজ্ঞাপনের চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে এইসব মেয়েরা।

জানি না আমাদের আনন্দ পাঠশালা আর কতদিন চালাতে পারব। এসব কাজে বিঘ্ন ঘটানোর মানুষেরও অভাব নেই। তবে আমার মনে হয়, এই শিশুদের একটু দাঁড়াবার জায়গা, অন্তত একটু বিরাম নেবার বা চোখ মোছবার মতো ছায়া গড়া খুব কঠিন কাজ নয়। আমাদের মতো দুর্বল হতভাগারা তো তিন বছর চালালাম! অনেক বন্ধুও তো পেলাম। দু-একটা বৃত্তান্তও তো বলা গেল।

উ মা

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৯৫৬) ৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হল

১। প্রকাশস্থান: বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ০৬৪

২। প্রকাশকাল: ত্রৈমাসিক

৩। প্রকাশক ও মুদ্রক: বরুণ ভট্টাচার্য

৪। মুদ্রণস্থান: জয়কালী প্রেস, ৮এ, দীনবন্ধু লেন। কলকাতা-৭০০ ০০৬।

৫। সম্পাদক: সমীরকুমার ঘোষ, ৫২/৫১, শশিভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন, কলকাতা- ৭০০ ০৩৬।

আমি বরুণ ভট্টাচার্য এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

১ মার্চ, ২০১৭ **বরুণ ভট্টাচার্য**
প্রকাশক

চিকিৎসা পরিষেবায় পারদর্শিতা

গৌতম মিস্ত্রী

মাসদুয়েক আগে কর্মসূত্রে দু দিনের জন্য কলকাতার বাইরে গেছি। সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই ভগ্নীপতির ফোন। আমার চেয়ে তিন বছরের ছোট বোন কলকাতা সংলগ্ন এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে মাত্র দু ঘণ্টা আগে। ওরা উত্তর কলকাতার বাসিন্দা। সাতসকালে বাড়ির সবাইকে জাগিয়ে, হাসপাতালে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে, ট্যাক্সি ডেকে বারাসাতের সদ্য গজিয়ে ওঠা এক হাসপাতালে পৌঁছনোর তাড়ায় কাউকে জানানোর সুযোগ হয়ে ওঠে নি। এই কর্পোরেট হাসপাতালের দেশব্যাপী নামডাক আছে। আমাদের শহরে এটি ঐ পরিচালনাগোষ্ঠীর দ্বিতীয় হাসপাতাল। এই ঘণ্টাদুয়েকের টানাপোড়েনের পরে আমাকে খবর দিতে পারল ভগ্নীপতি। সমস্যা শুরু বুকের ব্যথা নিয়ে। যদিও ও ব্লাড প্রেশারের ওষুধ খায় বলে জানি, ওর আকস্মিক হাসপাতালে ভর্তির ঘটনাটা আমাকে বেশিক্ষণ বিহ্বল করে রাখতে পারল না। কারণ ভগ্নীপতি পরের বাক্যেই বলে ফেলল, বোনকে এবারে করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। উৎকণ্ঠা, সংশয় ও অনিশ্চয়তার ঘোর কাটতে ৩০ সেকেন্ডের বেশি সময় লাগল না। ফোনেই শুনে নিতে হল বোনের বুকের ব্যথার ইতিবৃত্ত। মিনিট খানেকের মধ্যে সম্ভাব্য রোগনির্ণয় ও কর্মপদ্ধতি স্থির করে নিতে হল। তখন আমার একমাত্র চিন্তা কীভাবে, কত তাড়াতাড়ি আমার বোনকে শত্রুপুরীর জেলখানাসম হাসপাতাল থেকে মুক্ত করা যায়। ওর বুকের ব্যথার কারণটা যে জেনে ফেলেছি। সেটা আর যাই হোক না কেন, হার্টের রোগ যে নয় এটা বোঝার জন্য আমার ভগ্নীপতির কাছ থেকে বোনের বুকের কষ্টের বিবরণ শোনা আর তার বিশ্লেষণই যথেষ্ট মনে হল। এমন ক্ষেত্রে হাসপাতালের কব্জা থেকে ছাড়া পাওয়ার সময় একটা রীতিমতো যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। প্রথমে হার্টের রক্তনালীতে ব্লকের গল্প, হাসপাতাল থেকে বাইরে বেরোনো মাত্রই মারা যেতে পারেন এইসব ভয় ও শেষে আমলাতান্ত্রিক নিয়মের গেরো কাটিয়ে

মোটা অঙ্কের বিল মিটিয়ে বদলে যাওয়া নিষ্ঠুর পৃথিবীতে বোনের পুনঃপ্রবেশ। এমন ক্ষেত্রে ঝগড়াঝাঁটি না করলে হাসপাতালে চিকিৎসার নথিও মিলবে না। বেশ মানসিক জোর আর আত্মপ্রত্যয়ের অধিকারী না হলে হাসপাতাল থেকে মুক্তি পাওয়াটা সত্যিই বেশ মুশকিল।

আমার বোনের হার্টে যে কোন অসুখ হয় নি, এটা আমার কাছে কোনো প্রশ্ন হিসাবে খাড়া হয়ে ওঠে নি। অনেকের কাছে সেটা যথেষ্ট প্রত্যয়ের নাও হতে পারে। বড় বড় চোখ ধাঁধানো হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ হৃদরোগ বিশেষজ্ঞদের রোগ নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হয়। সেই প্রয়োজন কতটা প্রাসঙ্গিক ও মান্যতা পাবার যোগ্য আর কতটা অনুচ্চারিত ব্যবসার স্বার্থে সেই প্রশ্নের জুতসই বিনা বিতর্কের উত্তর মেলে না। একবিংশ শতাব্দীর ব্যবহারিক চিকিৎসা প্রযুক্তি আমাদের ব্যবহার উপযোগী এমন কোনো নির্দেশিকা দিতে পারে নি যেটা সমানভাবে, স্বচ্ছন্দে ও সফলভাবে জনগোষ্ঠীর উপরে প্রয়োগ করা যায়। ১৯৭০ সালে চাঁদের উদ্দেশে পাড়ি দেওয়া অ্যাপোলো ১৩ মহাকাশযান চাঁদে পৌঁছনোর আগেই দুর্ঘটনার কবলে পড়লে পৃথিবীর মাটিতে বসে সুসংহত কর্মপদ্ধতি নভশ্চরসহ মহাকাশযানটিকে নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হলেও, বুকের ব্যথায় সফল, খরচ-প্রাপ্তির অনুকূল ও নিরাপদ চিকিৎসা পদ্ধতির নির্দেশিকা উদ্ভাবন করা যায় নি। বুকের ব্যথার জন্য চিকিৎসা প্রযুক্তির ভাঁড়ারে পদ্ধতি আছে বিস্তর; নেই শুধু স্বচ্ছ, সহজবোধ্য, ১০০ শতাংশ সফল চিকিৎসার নির্দেশিকা। ফলে চিকিৎসক তার বিদ্যায় পারদর্শী হলেও সেই বিদ্যার প্রয়োগে প্রাপ্ত অভিজ্ঞান মনের কোণে আড়ালে থেকে যায়, প্রকাশ পায় অপরিণত ও অস্বচ্ছ চিকিৎসাবিধির স্বার্থপ্রণোদিত প্রয়োগ। রুগী বা আত্মীয়স্বজন কখনও হার্টের ব্লক চোখে দেখে নি, দেখার কথাও নয়। বরং বলা যায়, এক-দুবার আগে দেখে থাকলেও সেটা বুঝে নেওয়ার মতো করে দেখা নয়। অপারেশন করে পিত্তথলির পাথর বার করার পরে সেটা যে কেন রুগীর বাড়ির লোককে দেখাতে হয় সেটার কারণ বোঝা ভার। ডাক্তার যদি রাস্তা থেকে একটা-দুটো নুড়ি কুড়িয়ে পকেটে নিয়ে অপারেশন থিয়েটারে ঢোকেন আর অপারেশনের পরে সেটাই রুগীর পেট থেকে বের করেছেন বলেন, সেটা বুঝবেন কী ভাবে? কম্পিউটারে অ্যাঞ্জিওগ্রামের ভিডিও দেখানোর সময় (ধরে নিচ্ছি সেটা আপনারই বটে) আপনাকে যে ব্লকগুলো দেখাচ্ছেন সেটা দেখলেন, সেটা নিশ্চিতভাবে বুঝলেন তো? বোঝার কথাই নয়। চিকিৎসাশাস্ত্রের স্নাতক 'এমবিবিএস' পাস করা ডাক্তারদেরও সেটা নিশ্চিত করে বোঝার কথা নয়। অর্থাৎ আপনাকে আত্মসমর্পণ করতেই হচ্ছে চিকিৎসকের কাছে। তাহলে এই নাটকের কীই বা প্রয়োজন?

বুকের ব্যথার জন্য চিকিৎসা প্রযুক্তির ভাঁড়ারে পদ্ধতি আছে বিস্তর; নেই শুধু স্বচ্ছ, সহজবোধ্য, ১০০ শতাংশ সফল চিকিৎসার নির্দেশিকা। ফলে চিকিৎসক তার বিদ্যায় পারদর্শী হলেও সেই বিদ্যার প্রয়োগে প্রাপ্ত অভিজ্ঞান মনের কোণে আড়ালে থেকে যায়, প্রকাশ

কুচিকিৎসার বাজার ফুলে ফেঁপে উঠছে সেটা চোখ-কান খোলা রাখলেই বোঝা যায়। কুচিকিৎসার অনেক নির্ণায়ক আছে। চিকিৎসার ন্যূনতম সাজ-সরঞ্জাম মোটামুটি শহরের সব হাসপাতালেই একরকম। আমরা আপাতত ওপরের গল্প হলেও সত্যি ঘটনার অর্থাৎ আমার বোনের বুকের ব্যথার কুচিকিৎসার দুটো বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয়ে আলোকপাত করব। প্রথমটা পারদর্শিতার আর দ্বিতীয়টা সততার। চিকিৎসকের এই দুটি গুণই রোগমুক্তিতে আকাশপাতাল ফারাক এনে দেয়। সততার আলোচনা অন্য সময়ের জন্য তোলা থাক।

চিকিৎসার সাফল্যের কথা আমরা এই আলোচনায় উহ্য রাখছি। সাধারণ মানুষের কাছে উপলব্ধ গড়পড়তা শহুরে চিকিৎসায় সাফল্যের ফারাক বড় একটা দেখা যায় না। চিকিৎসকদের ভয় দেখানোকে গ্রাহ্য না করে স্বেচ্ছায় বোনকে হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বাড়ি যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ২০০ কিলোমিটার দূর থেকে। আমার সিদ্ধান্ত যে ভুল হয় নি তার উদাহরণ হার্টের রোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত আমার বোনের বর্তমান উপস্থিতি। এখানে মেনে নিচ্ছি, এই একটি উদাহরণ যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। অল্প আয়াসে খোঁজাখুঁজি করলে এমন উদাহরণ যে আরও মিলবে না তাও তেমনই সত্যি। সেই কাজ

সমাজবিজ্ঞানীদের। সম্ভাব্য সামাজিক অন্যায়ের আভাস অনুসন্ধানে আমার এই প্রয়াস।

আমার বোনের বুকের ব্যথার কারণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বেসরকারি হাসপাতাল আর আমার ফারাকটা একটু তলিয়ে দেখা যাক। চিকিৎসকদের মধ্যে কর্মপদ্ধতির পার্থক্য হয় যে কারণগুলির জন্য তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— ১) পারদর্শিতা, ২) সততা বনাম ব্যবসায়িক স্বার্থ আর ৩) ঝুঁকি নেবার প্রবণতা। ব্যক্তি হিসেবে চিকিৎসকের এই মানবিক বৈশিষ্ট্যগুলো নির্মাণে মেডিক্যাল কলেজের প্রশিক্ষণ, স্বকীয় মেধা ও তার সতীর্থদের সঙ্গে ভাব ও মত বিনিময় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এইখানে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছাত্রী নির্বাচনের প্রক্রিয়াও নিঃশব্দে চিকিৎসকের মান নির্ণয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা হিসাবে গণ্য হয়ে যায়। মেধাভিত্তিক ডাক্তারি পড়ার সুযোগের পাশাপাশি ক্যাপিটেশন ফিয়ের দৌলতে ডাক্তারি পড়ায় সম্ভাব্য মেধার ফারাক ছাড়াও অন্য শক্তিশালী নির্ণায়ক প্রচ্ছন্ন থেকে যায়। সেই অনুচ্চারিত নির্ণায়কটি হল মননের। শিক্ষার বড় মাপের অর্থের বিনিয়োগের পরে হবু ডাক্তারদের লগ্নি করা টাকার লাভক্ষতির হিসাব করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেই অনুচ্চারিত অতি স্বাভাবিক ইচ্ছের প্রভাব চিকিৎসা পরিষেবাকে প্রভাবিত না করলেই আশ্চর্য হবার কথা।

আপাতত আমরা ধরে নিই, একজন হৃদরোগের চিকিৎসায় প্রশিক্ষিত ডাক্তার তাঁর নিজের সহোদরার জন্য কোনো ঝুঁকি না নিয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিষেবা দেবেন। কোনোরকম আপস না করে আমি আমার বোনের বুকের ব্যথার জন্য আমার জ্ঞান অনুযায়ী সর্বোত্তম চিকিৎসা বিষয়ক মতামত দেব। বোনের চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক আমার চেয়ে কম ঝুঁকি নেবেন এটা মোটেই বলা যায় না। আবার রোগিণীর কাছে থাকার সুবাদে (আমি ২০০ কিলোমিটার দূরে আছি) আমার চেয়ে কম রোগলক্ষণ বিশ্লেষণ করার সুযোগ পাচ্ছেন অথবা আমার চেয়ে তথাকথিত কম পারদর্শী এই যুক্তিও ধোপে টেকে না। ঘটনা এই যে, আটকাতে না পারা অ্যাঞ্জিওগ্রাফিতে হৃদরোগ নির্মূল করা গেছে আর হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের হাজারো অনিচ্ছা, বাধা, রোষ ও সবশেষে শাসানি উপেক্ষা করে কোনোমতে আমার বোনটিকে হাসপাতালের কব্জা থেকে ছাড়িয়ে আনা গেছে। হ্যাঁ, সে এখনও সুস্থই আছে। তার হার্টের কোনো গোলযোগ নেই।

এই পূর্ব ধারণা মাথায় রেখে আমি পরবর্তী বিশ্লেষণে যাচ্ছি। সেটা আরও দুর্ভাবনার বিষয়। স্পষ্ট করে বললে, বুকের ব্যথা হার্টের নয় বলে চিকিৎসক বুঝতে পারলেও বেসরকারি কর্পোরেট হাসপাতালের পরিষেবা রোগী নিষ্পেষণের প্রভাবে কীভাবে বিকৃত ও বিক্রিত হয়ে যায় সেই উপলব্ধি একজন চিকিৎসক ছাড়া অন্য পেশার বিজ্ঞজনের বোঝার কথাও নয়। আমরা এবার কর্পোরেট হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মনের হাল হকিকতের বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করব।

চিকিৎসায় পারদর্শিতা ঃ সব ডাক্তার উচ্চমানের চিকিৎসায় খুব দিগ্‌গজ হয়ে উঠবেন এমন দাবি করা যায় না। পরীক্ষায় স্টার পাওয়া আর কোনোমতে পাস করা মানুষ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সাধারণত একইরকমভাবে ও সফলভাবে কাজের কাজই করে থাকেন। ব্যাঙ্কের হিসাবের খাতায় বা স্কুলের মাস্টারির কাজে গণ্ডগোল হয় না। ডাক্তারি পেশাতেও অনেক মধ্যমেধার বা অল্পমেধার ডাক্তারদের বেশ সফল হতে দেখা যায়। ডাক্তারি পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর যাচাই করে আমরা ডাক্তার নির্বাচন করে থাকি না। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা আসলে নির্বাচিত ডাক্তারের ডিগ্রি নিয়েও মাথা ঘামাতে ভুলে যাই। আপৎকালীন অবস্থায় এইসব নিয়ে কারই বা মাথা ঘামানোর অবসর থাকে! এসব নজরদারির কাজ সভ্য দেশের যোগ্য সরকার ও স্বশাসিত চিকিৎসকদের নিয়ামক সংস্থা করে থাকে। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি যাই-ই হোক না কেন, কোনোমতে কোনোকালে নাওয়া-খাওয়া ভুলে পরীক্ষার গণ্ডিটা পার করতে পারলে আর কোথাও যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে হয় না। তবে কিনা চিকিৎসাশাস্ত্র এখন ঝড়ের গতিতে আত্মপরিশোধনের কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত। গতকালের অভিজ্ঞান আজ বাতিল। নিত্যনতুন উদ্ভাবনের খোঁজখবর না রাখলে নতুন নতুন সৃষ্ট রোগের এবং পাল্টে যাওয়া পুরনো জানা রোগের নিরাময় প্রক্রিয়ার খবর না রাখলেও চলে না। কিন্তু এসব আর কে যাচাই করছে! জনবহুল ভারতে দু-তিন ঘণ্টা লাইন দেবার পরে পাঁচ মিনিটের জন্য ডাক্তারের সাক্ষাৎ মেলে মোটা দক্ষিণার বিনিময়ে। ডাক্তার আপনার শারীরিক সমস্যার বিনিময়ে নবতম ওষুধের কথা জানেন কিনা সেটা কাকে জিজ্ঞেস করবেন? ডাক্তার-রুগী সম্পর্ক এখনও দুঃখজনকভাবে বন্ধুত্বের ও সহমর্মিতার আঙিনা থেকে একপেশে প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কে আটকে আছে। ডাক্তার ছদ্ম উদাসীনভাবে দক্ষিণা গ্রহণ করে থাকেন ও দয়া করে কিঞ্চিৎ ওষুধ লিখে আপনাকে আমাকে ধন্য করে থাকেন। আর দয়া-দাক্ষিণ্যের বর্ষণে কিছু পাচ্ছেন সেটাই বড় কথা, কী

পাচ্ছেন সেটা নয়। আপনি চিকিৎসা কিনলে (মানে কিনতে বাধ্য হলেন) ক্রেতা সুরক্ষার সরকারি নজরদারি চিকিৎসকের প্রতি আপনার বশ্যতা চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে। আপনি বা আমি নিজ হাতে নিজের পায়ে কুড়ুল মারতে চাইব কী! ডাক্তারদের চটাতে বড় ভয়, কে জানে কখন কোন কাজে কেমনধারা ছাই ঝাড়তে বা রোগ সারাতে ডাক্তার বনাম ভাঙা-কুলো লাগবে। অতএব ডাক্তার অপছন্দের হলে অন্য ডাক্তার দেখো। এইভাবে মাছের বাজারে ঘুরে বেড়ানোর মতো খানিকটা ঘুরে নাও। অপছন্দের ডাক্তারের নিজ পছন্দের কাজের অভাব হবে না।

কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার অল্পদিনের মধ্যে ৫/১০ বছরের প্রশিক্ষণের জ্ঞান ফিকে হয়ে আসতে থাকে। তখন ভরসা শিক্ষক হিসাবে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। এর ব্যতিক্রম অবশ্য আছে, তবে তাঁরা প্রকৃত অর্থেই ব্যতিক্রমী এবং বিরল প্রজাতির চিকিৎসক। হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র, ইউনানি, রেইকি ইত্যাদির ভিড়ে এমবিবিএস ডিগ্রিধারীদের আত্মতুষ্টির একটা জায়গা সংরক্ষিত থেকেই যায়। এমডি হতে পারলে তো বিশেষজ্ঞ বনে যাওয়া যায়, শুধু অল্টারনেটিভ মেডিসিন নামক পাঠ্যক্রমের অল্টারনেটিভ মেডিসিনের এমডি ডিগ্রিধারীদের থেকে স্বতন্ত্রতা বজায় রাখা দুষ্কর হয়ে যায়, কারণ অল্টারনেটিভ মেডিসিন নামক অবৈজ্ঞানিক পাঠ্যক্রমের ডাক্তাররা এমডি ডিগ্রির সঙ্গে 'অল্টারনেটিভ মেডিসিন' লিখতে চান না। তেনারা লেখেন এমডি (এএম)। রুগী ভাবে, এটা বোধহয় শুধু এমডি-র চেয়ে অনেক ভারিক্কি। এ তো গেল 'ঠগ বাছাতে গাঁ উজাড়ে'র কথা। যদিও এই হাতুড়ে মার্কা ডাক্তাররাই আরএমও বা রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার হিসাবে অনেক বেসরকারি হাসপাতাল আর নার্সিংহোমের বেশি পছন্দ। কারণ এঁরা চট করে চাকরি ছেড়ে চলে যান না, আর এঁদের খাটুনির দাম পাস করা ডাক্তারদের চেয়ে বেশ কম। হাসপাতালের ইমারজেন্সি বিভাগে রাত বিরেতে শারীরিক সমস্যা নিয়ে যাঁরা হাজির হন তাঁদের রোগের কিনারা করার কাণ্ডারী কিন্তু এঁরাই। রোগলক্ষণ বিশ্লেষণের অধ্যায়টা একটা বিলুপ্তপ্রায় শিল্প। বুকের ব্যথার চিকিৎসার প্রাথমিক কাজটা এখন সোজাসাপটাভাবে দেখলে এই কাজে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চিকিৎসকের গুণের কদর মিলবে না। চিকিৎসকের পারদর্শিতা যেখানে অপাঙ্‌ক্তেয় সেখানে চিকিৎসকের বদলে একজন নার্স বা যে কোনও প্রশাসনিক হলেও একই কাজ করে নেওয়া যাবে। কী সেই কাজ?

অল্টারনেটিভ মেডিসিন নামক অবৈজ্ঞানিক পাঠ্যক্রমের ডাক্তাররা এমডি ডিগ্রির সঙ্গে 'অল্টারনেটিভ মেডিসিন' লিখতে চান না। তেনারা লেখেন এমডি (এএম)। রুগী ভাবে, এটা বোধহয় শুধু এমডি-র চেয়ে অনেক ভারিক্কি। এ তো গেল 'ঠগ বাছাতে গাঁ উজাড়ে'র কথা। যদিও এই হাতুড়ে মার্কা ডাক্তাররাই আরএমও বা রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার হিসাবে অনেক বেসরকারি হাসপাতাল আর নার্সিংহোমের বেশি পছন্দ। কারণ এঁরা চট করে চাকরি ছেড়ে চলে যান না, আর এঁদের খাটুনির দাম পাস করা ডাক্তারদের চেয়ে বেশ কম।

হাসপাতালের ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটের অন্দরমহলের নাটকের দৃশ্যগুলো একবার পুনর্নির্মাণ করে নেওয়া যাক। মনে করুন বুকের ব্যথার কারণে আপনি আপনার পছন্দের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হলেন। প্রথমে আপনার রক্তচাপ, পালস রেট ইত্যাদি মেপে (একজন নার্স হলেই চলে), একটা ইসিজি করা হবে ও বেশ কিছু রক্তপরীক্ষা হবে। আবহ গুরুগম্ভীর করে তোলার জন্য কার্ডিয়াক মনিটরের লাল নীল আলো আর বিপ্ বিপ্ শব্দও শুরু হয়ে যাবে, যদিও সেই মুহূর্তে কার্ডিয়াক মনিটরে নজরদারি করার মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম কোনো চিকিৎসক কাছেপিঠে থাকবেন না। উল্টো করে রাখা বোতল থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে একটি তরল পদার্থ (চলতি কথায় স্যালাইন) হাতের শিরায় প্রবেশ করতে থাকবে। এই মুহূর্ত থেকে এক নিমেষে এই একটু আগেও চলে-ফিরে নড়েচড়ে বেড়ানো আপনাকে বিছানায় পেড়ে ফেলে চলচ্ছক্তিরহিত করে দেবে। আপনার কষ্টের কথা বলার সুযোগ পাবেন না, কারণ আপনার মুখে অক্সিজেনের মুখোশ। এই কাজগুলোও ডাক্তাররা করেন না। এর পরে বিভিন্ন মাপের শিশি ও টেস্ট স্ট্রিপে আপনার রক্ত নেওয়ার পালা। এরা পেশাদার রক্তের নমুনা সংগ্রহ করার প্রকৌশলী, এদের নিক নেম ব্লিডার। এরপরে পোর্টেবল মেশিন নিয়ে আসবেন

ইসিজি ও এক্সরে টেকনিশিয়ান। হাসপাতালের কাছে রুগী চামড়া দিয়ে মোড়া কয়েকটি অঙ্গের সমাহার। আপনার মনের উৎকণ্ঠা, আপনার অনুভব, মানুষ হিসাবে আপনার প্রাপ্য ন্যূনতম সম্মান নিয়ে চিন্তাভাবনা করার মানুষজন হাসপাতালে মেলে না। এইভাবে আপনার ভিতর-বাইরের হালহকিকতের খুঁটিনাটি সংগ্রহ করা হয়ে গেলে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সঙ্গে মোবাইলে কথা বলবেন রাতের পাহারায় ভাড়া খাটা রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার। টানা ৭২ ঘণ্টা ডিউটি দেবার পরে রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার তখন সদ্য কড়া কফি খেয়ে মাথা খাড়া রাখার জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এমনিতেই এরপরে অ্যাঞ্জিওগ্রাফি হবার কথা দিনের আলো ফুটলে। ভিজিটিং ডাক্তাররা ওই কাজের জন্যই যে আসেন সেটা রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার জানেন। রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসাররা মাথা খাটানোর জন্য চাকরি করেন না। চিকিৎসায় পারদর্শিতার প্রয়োগের কোনো ফাঁকফোকর পাওয়া গেল কী? অর্থাৎ, সরকারি এবং কর্পোরেট হাসপাতালের বর্তমান পরিষেবার মডেলে একটা মৌলিক গলদ আছে। আপৎকালীন চিকিৎসায়, যেখানে প্রতিটি মুহূর্তের লড়াই 'যমে-মানুষে টানাটানি'র হারজিতের ফলাফল নির্ণয় করে সেখানে চাই সর্বোৎকৃষ্ট ও দ্রুত সমাধানে পারদর্শী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। সদ্য পাস করা, প্রশিক্ষণরত অথবা বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা বহির্ভূত অথচ ভারতীয় চিকিৎসা নিয়ামক সংস্থার স্বীকৃত বিভিন্ন শাখার ডাক্তারদের নিয়োগ সেখানে অবাঞ্ছিত। একজন অভিজ্ঞ হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ যত তাড়াতাড়ি ও নির্ভরযোগ্যভাবে বুকের ব্যথার ঠিক কারণটা নির্ণয় করতে পারবেন (তাঁর সততার প্রশ্নটা উহ্য রইল) ও সেটা পারবেন অনেক কম পরীক্ষনিরীক্ষা দ্বারা, ইমার্জেন্সি বিভাগের জুনিয়ার ডাক্তার সেটা করতে পারবেন না, বা করতে গেলে বেশি সময় নেবেন। তাঁর সেই কর্মকাণ্ডের জন্য অনেক বেশি পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োজন হবে। ডাক্তারি ব্যাপারটা কেবল পুঁথিগত বিদ্যা আর ডিগ্রির ভার দিয়ে চলে না। ডাক্তারি পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেটটা কেবল একটা লাইসেন্স একথা অভিজ্ঞ ডাক্তার জেনে যায়, ঠেকে শিখে যায়, শত সহস্র অসফল বেঠিক সিদ্ধান্ত, ভুলভ্রান্তি আর রোগ উপশম না হওয়া রোগীদের সঙ্গে মনোমালিন্য, হাতাহাতি, রক্তারক্তি, বিচারালয়ের দরজায় খটাখটি করে তবেই ডাক্তারের বুদ্ধিটা পাকে। ভাল প্রশিক্ষণ অপরিহার্য, কিন্তু সেটা তাঁর হাতেখড়ি মাত্র। আসল শেখার শুরু কর্মজীবন শুরু করার পরে। এর সঙ্গে অপরিহার্য হয়ে ওঠে আর একটি অনুষঙ্গের। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে মানবিকতার যুগলবন্দী না হলে সুচিকিৎসা হয় না।

ডাক্তারি জ্ঞানে মরচে পড়ে যাওয়ার আরও কারণ আছে। আমরা অর্থাৎ কচি নয়, এমন ডাক্তাররা ন্যূনতম চিকিৎসার পাঠ্যক্রম ভুলে যাই, কার্যত আর একবার পরীক্ষা নিলে এমবিবিএস-এর প্রথম সেমিস্টারের পরীক্ষাও উত্তীর্ণ হতে পারব না। একবার ডাক্তারি পরীক্ষাটা কোনোমতে উতরে গেলেই হাতে পেয়ে যাই অবাধ অনিয়ন্ত্রিত (!) হাত পাকানোর সুযোগ, যেটাকে মহিমান্বিত করে বলা হয়ে থাকে— 'মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশ'। সভ্য দেশে ডাক্তারি জ্ঞান সজীব রাখার উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ন্যূনতম নতুন জ্ঞান অর্জনের প্রামাণ্য নথি পেশ করতে হয় মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশন বজায় রাখার জন্য (CME credit)। তবে এটাতেও দুর্নীতি প্রবেশ করেছে। ভুঁইফোড় সংস্থা গজিয়ে গেছে, যারা কাঞ্চনমূল্যে আপনার দোরগোড়ায় 'নতুন জ্ঞান অর্জনের প্রামাণ্য নথি' বয়ে নিয়ে আসবে। আপনাকে সত্যি সত্যিই কিছু আর পড়তে হবে না বা লেকচার শুনতে হবে না।

চিকিৎসা পরিষেবায় পারদর্শিতার মানদণ্ড সরকারবাহাদুর ঠিক করে দিয়েছেন। সরকারি নিয়ামক সংস্থা আছে। কিন্তু তেনাদের হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তারদের পারদর্শিতা মাপার কাজে আগ্রহ নেই। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজের অনুমোদনের সুবিশাল কর্মকাণ্ডে তাঁরা গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছেন। সেই কাজ বড় মিষ্ট। মেডিক্যাল এডুকেশন নিয়েই তাঁরা অতি ব্যস্ত। যেন তাঁদের খাটুনির ফলে আধুনিক যুগের ডাক্তাররা আরও পারদর্শী ডাক্তার হয়ে উঠছেন। সেই পারদর্শিতার সুফল কবে ভোগ করতে পারব তারই অপেক্ষায় আছি।

পারদর্শিতা কথাটা বেশ গোলমেলে। আপনার বা আমার কোন সমস্যার সমাধান হল সেটাই বাস্তব মাপকাঠি, যেটা নিয়ে আপাতত আপনার আর আমার চিন্তাভাবনা করা উচিত বলে মালুম হয়। পারদর্শী ডাক্তার যদি মানবিক না হন তবে তাঁকে দিয়ে কাজের কাজ কিছু হবে না বলেই বোধহয়। আবার মানবিক ডাক্তারের জ্ঞানের ভাড়ার যদি ঠনঠনে হয় তবে তাঁর উপরেও ভরসা করা যাবে না। চাই এই দুয়ের এক মিশেল। এক ভারসাম্যের পরিষেবা। কেবল ম্যাজিকের প্রত্যাশী হয়ে অনন্তকাল অপেক্ষা করার সময় বা রুচি থাকবে কি না সেটা আমাকে আর আপনাকেই স্থির করতে হবে। বাইরে থেকে এই পাওনাটা আপনার প্লেটে কেউ সাজিয়ে দেবে না।

উমা

পূর্ব কলকাতার জলাভূমি

ধ্রুবা দাশগুপ্ত

তৃতীয় তথা শেষ কিস্তি

প্রঃ এই যে শ্রমিকদের মধ্যে থেকে দালাল তৈরি হওয়া— তাদের মধ্যে যদি সৎ নেতৃত্ব তৈরি হত, তাহলে শ্রমিকদের মধ্যে দালালি করার যে একটা প্রথা শুরু হয়ে গেল, এটা হয়ত আর হত না।

উঃ এটা বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে, বাস্তবটা কী? বাস্তবটা হচ্ছে একটা ভেড়িতে আমরা কাজ করি। মালিকানা পার্ট থেকে শ্রমিকদের পার্টে আসছে। এই সময়কালে মালিক চেষ্টা করে কিছুতেই যাতে শ্রমিকেরা দখল না নিতে পারে। তাহলে তাদের দুটো কাজ করতে হবে। সরকারিভাবে উকিল-মুহুরি এসব তারা নিয়ন্ত্রণ করবেই। কিন্তু এই শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়ে দেওয়ার কাজটা করতে গেলে শ্রমিকেরই দরকার হবে। সেই শ্রমিক, যে আমার কথা শুনে এটা করতে পারে। সে তো বিনা পয়সায় করবে না, তাকে টাকা-পয়সা দিতে হবে! এই শ্রমিকের ভেতরে বিভিন্ন চরিত্রের মানুষ আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব চরিত্র আছে। সেই চরিত্র অনুযায়ী— সেটা শুধু ভেড়িতে থাকা অবস্থায় তৈরি হয় নি, তার পরিবেশ থেকে সে চরিত্র তৈরি করেছে। সেই চরিত্রের ফলে মালিকেরা দেখছে যে, একে দিয়ে শ্রমিকদেরকে চাপে রাখা যায়।

প্রঃ মালিকেরা যেমন একটা ক্ষমতার স্তর, তেমনই যখন রাজনৈতিক নেতৃত্ব এল, সেও তো একটা ক্ষমতার স্তর, উল্টোদিক থেকে। যখন দেখা যাচ্ছে যে একটা নেতৃত্ব দিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে ভাঙন ধরানোর চেষ্টা হচ্ছে, তখন আর একটা নেতৃত্ব দিয়ে জায়গাটাকে ধরে রাখার যে প্রচেষ্টা, সেটা হলে আখেরে কিন্তু লাভ হত।

উঃ ধরুন, একটা ভেড়িতে একটা আন্দোলনের নেতৃত্ব তৈরি হল। বেশিরভাগ শ্রমিক কিন্তু তার পক্ষে আছে। তার মধ্যে সেই নেতৃত্ব তৈরি হয় নি। তার মধ্যে কিছু কিছু— তাদের সুবিধাবাদী বলি বা মালিকের দালাল বলি বা ধান্দাবাজ বলি বা মস্তান বলি, তারা কিন্তু মালিকের পক্ষে চলে গেল পয়সার বিনিময়ে। মালিকের হয়ে শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে লাগল, শ্রমিকদের মধ্যে ভাঙন শুরু করল।

'এই চল তুই আমার সঙ্গে...' নিয়ে গেল আমাদের বিপক্ষে। তাকে কিছু পয়সা দিল, মালিক একটু খাইয়ে দিল অথবা বলল 'এই ৫০০০ টাকা নিয়ে যা', ইংলিশ মদ খাবে, একটু খাইয়ে দেবে, মালিকের পক্ষে যেন থাকে। শ্রমিকদের মধ্যে ভাঙন ধরানো, বিভেদ সৃষ্টি করা, এইসব অপকৌশলগুলো তারা করে। এই আন্দোলনগুলো কেন বেশিদিন টেকে না, আমাদের মতো লোকেরা কেন বিব্রত হয়, বিপদে পড়ে, এর একটা কারণ হচ্ছে নেতৃত্ব। ধরুন একটা সেন্ট্রাল নেতৃত্বর কথা বলি— উঃ ২৪ পরগনার ভেড়ি মজদুর ইউনিয়ন সেখানে যে নেতৃত্ব রয়েছে, মালিকেরা দেখতে চেষ্টা করল যে দেখি আমি যদি কন্ট্রোল করতে পারি। তিনি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তিনি সরাসরি ভেড়ির সঙ্গে যুক্ত নন। এসে বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করেন না। তাঁকে যদি কোনও মালিক কন্ট্রোল করে, পাবে ২৫০০০ টাকা, কিন্তু যে নেতৃত্ব তৈরি হয়েছে সেই নেতৃত্ব কোথাও গিয়ে রাস্তা পাবে না। এদের মধ্যে নানারকম অপকৌশল কাজ করে। কোনো মালিক ধরুন আজকে যদি আমি চকের ভেড়ির মালিক হতাম, তো আমি যতদিন বাঁচব ততদিন আমার মনে হবে যে এই ভেড়িটা আমার ছিল। লক্ষীকান্ত প্রামাণিকের ছেলে বা তার নাতিরা কিন্তু এখনও মনে করে যে, আমার পূর্বপুরুষ লক্ষীকান্ত প্রামণিক গ্রামটির জমিদার ছিল। আমার বাবা ছিল সন্তোষ প্রামাণিক। আমি এই ভেড়ির মালিক, আমাকে এই ভেড়িকে রক্ষা করতেই হবে। দেখি কোথা থেকে কী করা যায়। সে সবসময় একটা চেষ্টা করবে। আগে মালিকরা ভয় দেখাত। এখন মালিক এসে বাবু বলে। কাজেই বুঝতে হবে যে তারা ধান্দাবাজ।

'ঠিক আছে, তোমরা এটা করে দাও তার জন্য এত টাকা দিতে হবে।'

'দেব।'

'কিছুই পাচ্ছি না, যায় যাক, কিছু যদি আসে।' (স্বগত)

মালিকেরা এটা সবসময় চেষ্টা করে যায়। তার ভেতরে থেকেই আন্দোলন, লড়াই। মানুষকে নিয়ে করা। যাদেরকে

নিয়ে আমি আন্দোলন করছি, তারা তো নিরস্ত্র। তারা সাধারণ মানুষ। তারা কি লাঠি ধরা লোক? না, তারা সংখ্যায় বেশি। কিন্তু যারা সংগঠিত, যাদের হাতে অস্ত্র আছে, পয়সা আছে, তারা হচ্ছে আমার বিরুদ্ধে। এই আন্দোলনটা করতে গেলে একটা জীবনের ঝুঁকি থাকে, মার খেতে হতে পারে, মরতে হতে পারে। এটা নিয়ে কতবার তো সমস্যায় পড়লাম। মাঝখানে একবার বাড়ি থাকতে পারি নি। সেই সরদার ভেড়ি গিয়ে বিকেল হলে চলে যাব, সকালে ৮-৯টায় বাড়ি ফিরব। কি অবস্থায় নিজের পরিবার নিয়ে কেটেছে ৩-৪ মাস, বাচ্চা কাচ্চারা পড়াশোনা করতে পারছে না। বড় পরেশে ওরা নিশ্চয় খবর পায় যে আমি ওদের পক্ষে কথা বলি না। তার জন্য চেষ্টা করেছে (শান্তিবাবু কয়েক মাস আগে বীভৎসভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন)। এই হচ্ছে নেতৃত্বের সমস্যা।

প্রঃ যারা স্থানীয় নেতৃত্ব তাদের সঙ্গে মাটির সংযোগ থাকবেই। তাদের তো ওখানে থাকতে হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের রক্ষা করার যে ব্যবস্থা সেটা করার জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কোনোদিন মন দেয় নি। তাই ঝুঁকি নিয়েই আগে ও কাজ করতে হয়েছে, এখনও কাজ করতে হচ্ছে, ভবিষ্যতে ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে, এইটাই তো?

উঃ ঠিক তাই।

প্রঃ বনবীর বিশ্বাস জোর দিয়েছিলেন যে, বাবার পর ছেলে বা তার পরিবারের কেউ কাজ পাবে। এটা এই এলাকার পক্ষে ভাল ছিল। তিনি খুব দাপুটে নেতা ছিলেন। কিন্তু এই নিয়ম চালু হবার কিছুদিন পরে তাঁকে খুন হয়ে যেতে হল। এটা যে উদাহরণ সৃষ্টি করে সেটা খুব নেতিবাচক। তাহলে কি আর ভাল কাজ করা যাবে না?

উঃ বনবীর বিশ্বাস নেতা ছিলেন ঠিকই , আরএসপি-র নেতা। কিন্তু এই ধারাবাহিকভাবে কাজ পাবার কথা ওঁর মাথার থেকে আসে নি। উনি ভেড়িতে ভেড়িতে গিয়ে নেতৃত্ব দিতেন। ওখানকার যারা মানুষ, তারা তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছে যে, কোন জিনিসটা প্রয়োজন। বনবীর বিশ্বাস বলুন, পঙ্কজ মাকাল বলুন, হৃদয় মণ্ডল বলুন— এঁরা সকলেই শ্রমিকদের বিষয়টা ভাল করে অনুধাবন করেন যে, তারা যা বলছে তা কতটা যুক্তিযুক্ত, কতটা গ্রহণযোগ্য। তারপর তাঁরা কোন কোন দাবিগুলো আদায় করা দরকার সেটা তালিকাভুক্ত করে মালিকের সঙ্গে আলোচনায় বসতেন । তারপরে যে কটা আদায় করতে পারেন সে কটা করলেন। যে কটা হল না, পরের বার আবার তা নিয়ে আন্দোলন করলেন। এইগুলো আন্দোলনের ব্যাপার।

ভেড়ি এলাকায় সময় বেঁধে দেওয়ার ব্যাপারটা শ্রমিকরা দাবি করেছিল। সেটাকে কার্যকর করার জন্য বনবীর বিশ্বাস, হৃদয় মণ্ডল, পঙ্কজ মাকাল— এঁদের সঙ্গে আরও অনেক নাম আছে, মানুষের দাবি ছিল ৪ ঘণ্টা জলে, আধ ঘণ্টা ডাঙায়। দুজন করে টঙে থাকার বিষয়, একজন নয়।

নিজেদের দলের মধ্যে রেষারেষি হবার ফলে বনবীর বিশ্বাস প্রাণ হারান খেয়াদহে।

বনবীর বিশ্বাসের আগেই স্থানীয় নেতৃত্ব এই বিষয়টা নিয়ে মালিকদের সঙ্গে বসত। কিন্তু এটা আদায় করতে সময় লেগেছে অনেকটা। যতদিন মালিকানা ব্যবস্থ ছিল ততদিন মালিকেরা বলত উপযুক্ত না হলে তাকে আমরা কাজেই নেব না। বাবার জায়গায় ছেলে? কখনওই সেটা সম্ভব নয়। যদি দেখি বাবার জায়গায় ছেলে উপযুক্ত, তাহলে কেন নেব না? বাবা আগে অকর্মণ্য হোক! তাকে দিয়ে যদি আমার কাজ চলে, তাহলে তাকে নেব। তার দুটো কারণ ছিল। বাবা যতটা মালিককে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, মান্য করে তার ছেলে এলে সেটা হবে না— এটা মালিকের একটা ভয় ছিল। সেইজন্য ছেলেকে নিয়ে মালিকের বিরুদ্ধের ক্ষমতাটা বেশি আসুক বা আন্দোলনের জোরটা বেশি হোক এটা আবার মালিকেরা চায় নি। ১৯৭৭ সালের পর থেকে যখন শ্রমিকেরাই মালিক হতে শুরু করল বা মালিক সেখানে দুর্বল হয়ে গেল বা যৌথ মালিকানা, ধরুন ৭-৮ জন মিলে একটা লিজ করল বা আমাদের ভেড়ি যেমন ১২ জন মিলে একটা লিজ করেছে, তারা ১২ জন পরিচালনা করে লাভ লোকসান দেখে নিচ্ছে।

মালিকেরাও নেবে না, আমরাও ছাড়ব না। তারাও যে মালিক হিসেবে খুব বড়লোক তাও নয়। তবে তারা একটা সময় মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। এটা ৯০-এর দশকের কথা। ৯০-এর দশকের গোড়ায়ও নয়। ৯০-এর দশকের পর থেকেই এই সবগুলো বেশি চালু হয়েছে। যে জায়গাটায় আমরা এলাম সেটা হল ভেড়ি অঞ্চলের শ্রমিক আর মালিকের মধ্যে সঙ্ঘাতের ধারাবাহিক একটা পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে— মালিকানা ব্যবস্থাটা ভেঙে গিয়েছে। এখন শ্রমিক মালিক হয়েছে। কোথাও তারা সরকারিভাবে মালিকানা পেয়েছে, কোথাও এখনও পায় নি, কিন্তু তারা মালিকানা পার্টেই চলে এসেছে। যৌথ মালিকানা খুব কম ভেড়িতেই আছে। নীতিরবাবুর খোলে একটা আছে। ওদিকে সরদার ভেড়ি বলে একটা ভেড়ি আছে সেখানে লিজ মালিক এবং শ্রমিক মিলে করছে। এখন নিট মালিক খুব কম ভেড়িতে আছে। একেবারে

নিজস্ব সম্পত্তি এরকম খুব কম ভেড়িতেই আছে, বেশিরভাগ ভেড়িতেই শ্রমিক মালিক হয়েছে এবং যৌথ মালিকানা।

প্রঃ মেয়েরা কবে থেকে কাজে ঢুকতে আরম্ভ করল?

উঃ ৯০-এর দশকের পর থেকে।

প্রঃ এটা কি কোনো বাড়ির লোকের পরিবর্তে?

উঃ ডিরেক্ট মালিকানা যখন ছিল তখন কোনো মালিক মেয়েদের নিত না। শ্রমিকের আয়ত্তে এসেও কোনো শ্রমিক সংগঠন মেয়েদের নিতে চায় নি। এরা এসেছে সাধারণত স্বামীর পরিবর্তে। স্বামী মারা গিয়েছে, পারছে না, ছেলে অন্য কাজে রয়েছে, কে করবে? তাই তার স্ত্রী এসেছে।

প্রঃ এই যে সিদ্ধান্ত নেওয়া যে মেয়েদের রাতের কাজ দেওয়া হবে না এবং মেয়েরা ছেলেদের সমান রোজের দাম পাবে, এই সিদ্ধান্তগুলো কবে থেকে হল?

উঃ মেয়েদের মজুরি আর ছেলেদের মজুরি সমান হবে তার কারণ হচ্ছে ভেড়িটা সবাই মিলে করছে— মেয়েরা ও মালিক, ছেলেরাও মালিক অথবা ছেলেদের পরিবর্তে মেয়ে মালিক। তাই সেখানে তাদের জন্য আলাদা করে ভাবা হয় নি, সবাইকে সমান করে দেওয়া হয়েছে। মেয়েদের কাজে পুরুষের সমান মজুরি তারা অনেকদিন ধরেই করে আসছে, তাই সেটা মেনে নেওয়া হয়েছে।

রাতের ডিউটিতে মেয়েদের না নেবার কারণ সর্বত্র মেয়েরা ছেলেদের থেকে দুর্বল। এটা তো গ্রামে নয়, এক প্রান্তে। সেখানে যদি দুজন মেয়ে থাকে আর রাত্রে সকলেই ঘুমিয়ে পড়ে। এই সময়ে যদি চোর আসে দুজন মেয়ে কী করবে? মেয়েদের তাই রাতের ডিউটি দেওয়া হয় না। তাছাড়াও অনেক কাজ আছে যা মেয়েদের দেওয়া হয় না। যেমন, জাল টানা। এটা মেয়েদের পক্ষে সম্ভব নয়। জেলেরা তো জলে নামে মালকোঁচা মেরে, জলে লাঠি মারতে হবে, পাড়ে এনে তুলতে হবে— এগুলো মেয়েদের পক্ষে সম্ভব নয়। কষ্টকর কাজের দিকে না রেখে মেয়েদের একটু হাল্কা কাজের দিকে রাখা হয়েছে। যেমন, পানা তোলার কাজ, জমি পরিষ্কার করা, হাঁটু জলে ঝিলে জাল টানা, ধরা, পুকুর চাঁছা, গাছপালাগুলো কাটা, সাফ করা, হয়ত ঝিলের একটা জায়গায় একটু মাটি কেটে দিতে হল এইসব।

প্রঃ মালিকানা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার পরে পুঁজির কিন্তু একটা প্রয়োজন হয়েছিল এবং অভাব দেখা দিয়েছিল। এটার কোনো বিকল্প নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হয়েছিল কি? লিজ মালিকেরা গোলদাররা এসেছিল ঠিকই কিন্তু তারা খুব বড় পুঁজির অধিকারী তো ছিল না। একটা পুঁজি, একটা বাজার— এই দুটো জিনিস না হলে তো মাছচাষের শ্রীবৃদ্ধি হয় না।

উ ঃ মালিক যখন চলে গেল, সেই সময় শ্রমিকেরাও করতে পারছে না পুঁজির অভাব। শ্রমিকদের অবস্থা এমন যে তাদের পুঁজি নামিয়ে ভেড়িটা চালানোর মত ক্ষমতা নেই। পড়ে রয়েছে ভেড়ি। মালিকও নেই। শ্রমিকেরাও পারছে না। এইরকম জায়গায় যাদের আর্থিক অবস্থা একটু সম্পন্ন, যাদের পুঁজি ব্যবহার করার মতো ক্ষমতা আছে— একার পক্ষে সম্ভব নয়, ১০ জন মিলে ঠিক করল যে ভেড়িটা যদি আমরা ১০জন মিলে করি, তাহলে করা যায় কিনা। মালিকের সঙ্গে চুক্তি করল যে আমরা এতজন মিলে করব, বছরে কত টাকা লিজ দিতে হবে? মালিক বলল এত দিতে হবে। তাহলে আমরা যদি লিজের টাকা দিই তারপর যা উপকরণ আর পরিকাঠামো আছে সমস্ত গুছিয়ে ভেড়িটাকে সাজাতে কত টাকা লাগতে পারে? ধরুন তারা দেখল যে ৫ লাখ টাকা লাগতে পারে। তাহলে ১০ জনের প্রত্যেককে ৫০,০০০ টাকা করে দিতে হবে। তা হয়ত প্রত্যেকের ঘরে নেই। তখন ওরা ঠিক করল যে ৪ লাখ টাকা যদি আমরা বের করতে পারি, বাকি ১ লাখ টাকা আমরা অন্য দিক থেকে পাই, যেমন কাঁটা ব্যবসায়ী, তার কাছ থেকে যদি আমরা টাকা ধার নিই, তার কাঁটায় মাছ দেব। এটা হচ্ছে টাকা ধার নিচ্ছি, তার কাঁটায় মাছ দেব আর ধারটা আস্তে আস্তে শোধ করে দেব। এটা দাদন নয়। দাদন বা চটিতে (চটিদার প্রথা) আজকে দু টাকা ধার করলে কাল শতকরা দু টাকা বা চার টাকা বেশি দিয়ে শোধ দিতে হবে।

লিজ মালিকেরা যখন টাকা তোলে তখন শর্ত থাকে যে আমরা তোমার কঁটায় মাছ দেব আর কোনও কঁটায় মাছ দেব না, আমরা ৬ মাসে বা ১ বছরের মধ্যে টাকা শোধ করে দেব। এটা ছিল লিজ মালিকদের করার পদ্ধতি।

আরা শ্রমিকেরা যদি করে, তারা বলল সবাই মিলে আমরা যদি করি তাহলে কত করে হবে। যদি ৫ লাখ টাকা মোট লাগে আর ৭০-৭৩ জন শ্রমিক থাকে তাহলে কত করে হবে? তারা ঠিক করল যে কাঁটার থেকে দেড়লাখ নেব। বাকি টাকা ৭৩ জন ভাগ করে নিতে হলে কত করে পড়বে? দেখা গেল ৪ হাজার টাকা করে পড়ছে (শ্রমিকপিছু)। কারোর বেশি দেবার ক্ষমতাও আছে। কিন্তু বেশি দেওয়া তো নিয়মে নেই। এই চকের ভেড়িতে মালিকেরা চলে গেলে লিজ মালিকেরা করত। তারাও চলে গেলে আমরা শ্রমিকেরা করতে থাকলাম। তারপর থেকে সেই চলছে— শেয়ার পাওয়া, রোজ মজুরি পাওয়া, পুঁজিও একটা রয়েছে, ব্যাঙ্কে থাকে। পুঁজি রোলিং হচ্ছে, রোজ টাকা আসছে, মজুরি দেওয়া হচ্ছে এর

থেকে একটা টাকা। বাকি থাকছে,আবার মাছ ফেলার সময় সেটা ব্যবহার করা হচ্ছে। যদি কমও পড়ে কাঁটার থেকে ধার নেওয়া যাচ্ছে। এইভাবে ভেড়িগুলো চলছে।

প্রঃ তবুও বোধহয় একটা চাপ থেকে যাচ্ছে ডিম আনার ক্ষেত্রে, ৩৬৫ দিন রোজ দিতে গেলে মাছের সাইজ একটা মাপের বেশি হতে পারবে না আর ময়লা জলটাই যদি কেবল মাছের পুষ্টির জন্য হয় তাহলে সেখানেও সমস্যা আছে।

উঃ বুঝেছি আপনি কী বলছেন। শুধু ময়লা জলে হবে না মাছচাষ। ময়লা জলের উপর নির্ভর করে যদি মাছচাষ করতে হয়, তাহলে সারা বছর শ্রমিককে কাজ দেওয়া, তার সংসার পরিবার পরিজনকে রক্ষা করা বড় মুশকিল হয়। সারা বছরে ময়লা জলের অভাবও হয়, কখনও স্বাভাবিক থাকে, কখনও যথেষ্ট থাকে না। সেই সময়ে খাদ্য দিতে হয়। তার জন্য নানা রকমের খাদ্য আছে। ভুষি আছে, অন্যান্য খাবার আছে। সেসব নিয়ে দিতে হয়। এছাড়াও ভেড়িতে বিভিন্ন সময়ে জল দেখে পোকা লাগে মাছের গায়ে। পোকা ছাড়ানোর জন্যও ব্যবস্থা করতে হয়। মাটির তলায় গ্যাস হয়ে গেলে চুন দিতে হয়। তারপর মাছকে তাড়াতাড়ি বাড়ানোর প্রয়োজনে খোল দিতে হয়। ধানি মাছকে ১০০০ গুনতি থেকে ৬০টা গুনতি আনার জন্য তাড়াতাড়ি খোল দেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে সর্ষের খোল ভিজিয়ে দিতে হয়। এটা মাছ খেলে তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে।

মাছচাষ করতে গেলে যারা মাছচাষের সঙ্গে যুক্ত তারা একটা হিসেব করে যে কীভাবে মাছটাকে তাড়াতাড়ি বাজারজাত করা যায়।

প্রঃ আপনি বোধহয় এটাও বলছেন যে, যারা ভেড়ি পরিচালনা করে তারা যদি এই ক্রমাগত চাপ মোকাবিলা না করতে জানে, তাহলে একটা পুঁজির অভাব তৈরি হতে পারে?

উঃ কতগুলো জিনিস আমি অভিজ্ঞতায় বুঝেছি। অনেকদিন তো ভেড়ির ধারে থাকলাম। ফলে একটা জায়গায় আমার বারবার খটকা লেগেছে মনটা, যে আমাদের সমাজব্যবস্থার, মানসিক চিন্তার পরিবর্তন হওয়া দরকার। ধরুন, ভেড়িতে একটা সংগঠন শ্রমিকেরা তৈরি করল। ১০ জন কি ৯ জনের একটা কমিটি হল। সেই কমিটি ঠিক করল কাকে সম্পাদক রাখবে, কাকে সভাপতি রাখবে, কো কোন দায়িত্ব নেবে। বেড়ি পরিচালনা করছে তারা, ভালই চলছে। কিন্তু যা দেখেছি, মানুষের জীবনধারা ভাল অবস্থার থেকে একটা সময় খারাপ অবস্থায় যায়। আজকে যে খেতে পেত না, তার খাবার সংস্থান হল, একটা থাকার ব্যবস্থা হল, অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যথেষ্ট হল, জীবনযাত্রার মান পরিবর্তন হল, তারপর এক আয়েসি জীবন তৈরি হল। সে ক্ষেত্রে তার মৌলিক, যে ভবে সে বাঁচত, সেই দিক আর থাকল না, সেটা একটা ভিন্ন দিকে মোড় নিতে থাকল। এই দিকটা তার শিথিল হয়ে গেল। এই ক্ষেত্রে আমি দেখেছি যে কমিটি একটা দায়িত্ব নিল। ভাল চলছিল, ভাল চালাচ্ছিল। এইবারে তারা একটু বাবু হয়ে গেল। সম্পাদক, সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ এরা একটু বাবু টাইপের হয়ে গেল। জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন হল, তাকে কায়িক পরিশ্রম করে খেতে হচ্ছে না। তাকে মাটি কাটতে হচ্ছে না, জাল টানতে হচ্ছে না, জল পরিষ্কার করতে হচ্ছে না— সে শুধু দর্শক হয়ে গেল। সে শুধু বলছে, আচ্ছা এটা করছিস, এটা কর, সেটা কর তোরা— ম্যানেজার। এই ম্যানেজার— এই মালিকানা ব্যবস্থা থাকলে ঠিক ছিল। কিন্তু শ্রমিক যখন মালিক হল তখন এই ম্যানেজারিটা কোথায় আর? কার্যকরভাবে এই ম্যানেজারি করাটা ঠিক না। এটা আমার বারবার মনে হয়েছে। কারণ সে শ্রমিক, তাকেও কিন্তু পরিশ্রমের সঙ্গে থাকতে হবে। বাড়তি চিন্তাটা তার পরিচালনা করা। শুধু পরিচালনার দায়িত্ব দিলেই তার কিন্তু আয়েসি জীবন হয়ে যাবে। সে তখন আর ভাববে না, আমাকে পরবর্তী সময়ে আবার এটা করতে হবে।

প্রঃ এটা কিন্তু কমবেশি সব ভেড়ির ক্ষেত্রেই ...

উঃ হচ্ছে, হচ্ছে। আমি দেখছি কিছু কিছু শ্রমিক যারা এইসব বিভিন্ন রকমের কমিটির মধ্যে ছিল, তারা এমন কিছু কৌশল আবিষ্কার করে ফেলেছে, নানা ধান্দায় তারা ফাঁকি দেয়। কিন্তু আমিও একজন ভেড়ির সদস্য, আমিও একজন ভেড়ির শ্রমিক— এই কথাটা মনে রেখে সে যদি জালের বহরটা ধরে, সেও যদি লাঠি পিটতে যায়, সেও যদি নৌকাটা ঠেলে, সেও যদি বাঁধে গিয়ে একটা কাজ করে সেই শ্রমিকদের সঙ্গে, তাহলে সেই শ্রমিকরা খুশি হয়। তারা দেখল যে না এ নেতা বটে, কিন্তু এ আমাদের সঙ্গে কাজ করছে। একটা আন্তরিকতা থাকে, বিশ্বাসও আসতে থাকে। কিন্তু তারা মনে করে বাবা, ওই বনমালী যেরকম ছাতা মাথায় নৌকায় বসে মাছধরা দেখত, এও তো তাই করছে। হলটা কি? ওরা আজকে মালিকের চরিত্র পালন করছে, আর আমরা শ্রমিকের চরিত্র পালন করছি। পার্থক্যটা কোথায়?

একটা বই পড়েছিসুম সেটাতে দেখেছি যে যাকে বাহিনীর ইনচার্জ করা হল, সে বেশি খাটত। এটা যুদ্ধর ব্যাপারেও ঠিক, আর উৎপাদনের ব্যাপারেও নেতাই বেশি পরিশ্রম করত অন্য সদস্যর চাইতে।

এইখানে এরা ইতিহাস পড়ে না, দেখে না। যেখানে মালিক ছিল সে চলত, তার একটা দেহরক্ষী ছিল। সে তামাক সেজে দিত, মালিক খেত আর কাজের তত্ত্বাবধান করত। এরাও যদি সেরকম করে, এই ব্যবস্থাটাও ভেঙে যাবে। যদি ভেড়িটা একবার বসে যায়, তখন পুঁজিটা আসবে কোথা থেকে? ধার করতে হবে। ধার করতে গেলেই ধার তো শোধ করতে হবে।

প্রঃ সার্ভে করার সময় যাদের যাদের সঙ্গে কথা বলেছি তারা বারবার বলেছে 'কমিটি জানে'। সব জিনিসটাই 'কমিটি জানে'। শ্রমিকেরা সকলে ভেড়ি করবে, অথচ শুধু যদি কিছু লোকের উপর দায়িত্ব দিয়ে ঢিলে দিয়ে দেয়, তাহলে তো আর প্রশ্ন করা হয় না?

উঃ কমিটি সব খবর রাখে মানেটা কী? তাদের ভেবে চিন্তা হচ্ছে আমরা কাজ করতে এসেছি, কাজ করে চলে যাব, যা করবার কমিটি করবে। তার একটা কারণ হচ্ছে সে কমিটিকে অন্য চোখে দেখছে। আমার লোক, আপনজন, তাদের উপর দায়িত্ব আছে, অতএব তাকে আমাদের রক্ষা করা দরকার, সেটা তারা ভাবছে না।

এখন আমি দেখি যে লোক আসল, কাজ করল, বেরিয়ে গেল— পয়সাটা দাও, চলে যাচ্ছি। তারা চলে গেল। কত টাকার বিক্রি হল, কতটা মাছ গেল, এসব আর তাদের দরকার নেই। ভেড়িতে কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখার দরকার নেই। এটা যদি শ্রমিকেরা না করে তাহলে বুঝতে হবে কমিটির সঙ্গে শ্রমিকের একটা পার্থক্য হচ্ছে।

প্রঃ এটা বোধহয় কোন একটা জায়গায় একটা বিরাট সামাজিক ফাঁক থেকে যায়।

উঃ এই ফাঁকটার একমাত্র কারণ হচ্ছে মানুষের। একটা সমাজের পরিবর্তন ঘটে চারটে বিষয়ের উপরে— শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাজনৈতিক অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা। এই চারটে জায়গায় যদি দুর্বলতা থাকে তাহলে সেইখানে স্বাস্থ্যকর কিছু করতে পারবেন না। সবের মধ্যে একটা ফাঁক থেকে যাবে। আমাদের সমস্যাটা সেইখানে। এমন একটা রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেখানে কথা বলার সাহস বা অধিকার নেই। কি আন্দোলন করবেন? কাকে বোঝাবেন?

ধরুন চকের ভেড়ির কথা বলি। এমন একটা রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সেখানে দুটো দল, তারা থাকতে পারে, কিন্তু কারুর যদি কোন দলকে দাবিয়ে রাখার ইচ্ছা থাকে তাহলে কিন্তু বড় মুশকিলের ব্যাপার। কো অপারেটিভ অনেক আগেই হত। কিন্তু বেশ কিছু শ্রমিক কো অপারেটিভ করতেই দেয় নি। 'ওটা করে কী হবে? আমরা বিপদে পড়ব। কেন খাজনা দিতে যাব আমরা সরকারকে? যা উৎপাদন হয় আমরাই ভাগ করে খাই। সরকারের কাছে দিতে যাব কেন?' এই নানা রকম প্রশ্ন করে বিব্রত করে, কাজের সময় কাউকে পাওয়া যাবে না আর এই সময় বাধা দেবে। শুধু ভেড়ি কেন, জীবনেও তাই। সমস্ত স্কুল কলেজ পঞ্চায়েতে যে মানুষরা রয়েছে, যেখানেই যান, সেখানে যদি বিভেদ শক্তি কাজ করে তাহলে বড় মুশকিল। বিভেদ শক্তি তখন কাজ করে যখন রাজনৈতিক গণ্ডগোল দেখা দেয়।

প্রঃ রাজনৈতিক ডামাডোলটা এইখানে অনেক বছর ধরে থেকে গিয়েছে।

উঃ হ্যাঁ, থেকে গিয়েছে। এখন যেটা হয়েছে তা হল রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক, দুটোর সঙ্গে এমন সম্পর্ক। এখানে অর্থনৈতিক অবস্থাটা এক সময় অনেক দুর্বল ছিল। তখন কিন্তু এখানে মানুষের মধ্যে অনেক মিল ছিল। এখন অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক ভাল হয়েছে। প্রত্যেক বাড়িতে এখন বাইক ছুটছে। বাড়িতে ফ্রিজ, খাট, অন্যান্য জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জিনিস সব। অর্থ বেশ সঞ্চিত হয়ে গিয়েছে। ফলে এখন তারা আরও বেশি টাকা জমা হয়ে থাকা চাই, এটা ভাবছে। শিক্ষার অভাব। সেজন্য এরা কোন দ্বিধা করে না, প্রয়োজন হলে কাউকে মারা, প্রয়োজন হলে কারুর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া, প্রয়োজন হলে কারুকে লুট করে নেওয়া। এসব কাজ এখন শুরু করে দিয়েছে। আর রাজনৈতিক নেতা-দাদারা তাদের দল বাঁচানোর জন্য, ভোটের সময় কাজ করানোর জন্য তাদেরকে তারা প্রশ্রয় দিচ্ছে।

শেষের কথা

জলাভূমি সুদীর্ঘ ২২৫০০ হেক্টর জুড়ে ছড়িয়ে আছে এবং এর ইতিহাসের অভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্য অধ্যয়ন করতে বিস্তারিত সময় লাগবে। এখানে বলে রাখা ভাল যে ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভেড়ির মানুষের জীবনচরিতেরও তফাত আছে। শান্তিবাবু উত্তর ২৪ পরগণার ভেড়ি এলাকায় তার জীবন অতিবাহিত করেছেন, তার কাহিনী দক্ষিণ ২৪ পরকগণার ভেড়ির সঙ্গে যুক্ত মানুষদের থেকে বেশ কিছু জায়গায় পৃথক। এইগুলি ভবিষ্যতে আরো জানবার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলে তবেই ভেড়ির মানুষদের জীবনের মূল ধারাগুলির সন্ধান পাওয়া যাবে, এবং কলকাতাবাসী হিসেবে নিজেদের স্বার্থে এই মানুষগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। **উমা**

উত্তরবাংলার চা-বাগান

বিপন্ন শ্রমিক ও তাদের পরিবার

দার্জিলিং পাহাড়ে ২০৭৫ হেক্টর জুড়ে ধোত্রে, কলেজভ্যালি ও পেশক। এই ৩টি চা বাগানের ২৫৪৪ জন স্থায়ী ও ৩০০০-এর বেশি ঠিকাশ্রমিক ও তাদের পরিবার বিপন্ন। তাই প্রতিবাদে নেমেছে 'চা বাগান সংগ্রাম সমিতি (CBSS)'।

এই তিনটি চা বাগান ২০১৬-র জুলাই পর্যন্ত ছিল অ্যালকেমিস্ট গোষ্ঠীর। শুধু মৌখিক প্রতিশ্রুতিতে গত বছর আগস্ট-এ নতুন মালিক হল 'ট্রাইডেন্ট গ্রুপ'। তারপর থেকে দুই মালিকই বেপাত্তা। দুর্ভোগের শুরু কিন্তু সেই ২০১৫-তে। তখন থেকে মজুরি অনিয়মিত হতে শুরু করে। আর ২০১৬ থেকে বাগানের কাজ প্রায়ই বন্ধ থাকত। চা-শ্রমিকদের বোনাস নেই, মজুরি নেই। মিটিং মিছিল ধর্না অনশন দার্জিলিং-শিলিগুড়ি দৌড়োদৌড়ি কিছু বাদ যায় নি। তবু অচলাবস্থার সমাধান হয় নি। এই সমস্যাটি নিয়ে চা বাগান সংগ্রাম সমিতি (CBSS) কলকাতায় একটি সংহতি সভার আয়োজন করে। সভাটি হয় গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ কলকাতার কলেজ স্কোয়ার সংলগ্ন মহাবোধি সোসাইটিতে। সংহতি সভায় আনুমানিক ৫০ জন চা-শ্রমিক অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বিভিন্ন সংগঠন ও পেশার মানুষ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সবাই চা-শ্রমিকদের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানান, দাবিগুলির সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। চা-শ্রমিক আন্দোলনের নেতা চা-বাগানের চরম দুর্দশার কথা জানান। সরকারি উদাসীনতা ও মালিকদের দ্বিচারিতা এবং নিষ্ঠুর নীতি চা-বাগানের বর্তমান অবস্থার জন্য যে দায়ী এ ব্যাপারে সবাই একমত। CBSS-র প্রতিনিধিরা শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। এ ছাড়া ১ মার্চ প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

চিলগাড্ডা থেকে চাংশা

ভবানীপ্রসাদ সাহু

চারদিকে যতদূর চোখ যায়, উঁচুনীচু ছোটখাটো টিলা, ধূসর ফাঁকা পাথুরে মাঠ, কোথাও বা জঙ্গল। জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে, ছোট পাহাড়ের ওপারে হয়ত আদিবাসীদের এক-একটি ছোট গ্রাম। এমনই একটি গ্রাম চিলগাড্ডা। ঝাড়খণ্ডের বোকারো জেলার প্রান্তিক একটি গ্রাম। এই গ্রামে, পুরুলিয়া জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গের সীমানা থেকে হাঁটাপথে মিনিট পনের দূরে আশা বিহার। গাছে ভরা, পাঁচিলে ঘেরা বিরাট একটা চত্বর। পাশে ছোট্ট একটি পাহাড়ি নদী।

আশা বিহার বলতে আশপাশের বেশ কয়েকটি জেলার মানুষের কাছে একটিই পরিচয়, স্থানীয় ভাষায় 'লাকুয়া' অর্থাৎ নানা ধরনের প্যারালিসিস এবং গাঁটে কোমরে ঘাড়ে মাথায় বাত-ব্যথার হাসপাতাল। মূলত হয় আকুপাংচার চিকিৎসা। সেই সঙ্গে প্রয়োজনমতো অ্যালোপ্যাথি ও আয়ুর্বেদ ওষুধ। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকও আছেন। আছে প্রাথমিক ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থা। আকুপাংচার চিকিৎসা না করালেও, কিছু ক্ষেত্রে ওষুধপত্র দিয়ে চিকিৎসা করা হয়, তবে তার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। ইমার্জেন্সি চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই।

এখানে গড়ে প্রতিদিন ৫০ থেকে ৬০ জন রোগী ভর্তি থাকেন শুধু আকুপাংচার চিকিৎসার জন্যই। এই ভর্তি থাকা রোগী এবং বাইরে থেকে আসা রোগী, সব মিলিয়ে গড়ে ৯০-১১০ জনের প্রতিদিন আকুপাংচার চিকিৎসা হয় আউটডোরে– সকাল সাড়ে আটটা থেকে পাঁচটা। সারা ভারতে শুধু আকুপাংচার চিকিৎসার জন্য এত রোগী ভর্তি রাখা এবং সপ্তাহে সাত দিন ধরে প্রতিদিন এত রোগীর আকুপাংচার চিকিৎসা করার মতো হাসপাতাল আর আছে বলে জানা নেই। যে কয়েকটি আছে, সেখানে এত রোগী রাখাও হয় না। আকুপাংচারের সঙ্গে অন্যান্য চিকিৎসাও করা হয়, আকুপাংচার প্রধান নয়।

চীন ছাড়া বিদেশেও খুব বেশি আছে বলে মনে হয় না। আকুপাংচার মূলত সৃষ্টি হয়েছে চীন ভূখণ্ডে (ভারতবর্ষে যেমন আয়ুর্বেদ)। সেখান থেকে গত ৪০-৫০ বছরের মধ্যে শ্রীলঙ্কা থেকে অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা থেকে ইয়োরোপের নানা দেশ সহ অন্তত ১৫০টি দেশে এটি এখন প্রসারিত হয়েছে। গত ৭০-এর দশকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (হু) এই চিকিৎসাপদ্ধতির প্রসার, প্রয়োগ, প্রশিক্ষণ ও বিজ্ঞানসম্মত বিকাশের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। চীনে এর এই সবকটি দিকই যে পৃথিবীর অন্য সমস্ত দেশের তুলনায় সর্বোন্নত হবে, তা মোটামুটি জানা ছিল, তা স্বাভাবিকও। গত অক্টোবরে (২০১৬) চীনের হুনান ইউনিভার্সিটি অভ চাইনিজ মেডিসিনের আমন্ত্রণে অতিথি হিসেবে আকুপাংচার অ্যাসোসিয়েশন অভ ইন্ডিয়ার অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে ১০দিনের চীন ভ্রমণের সময় স্বচক্ষে দেখা গেল আকুপাংচার এবং ট্র্যাডিশনাল চাইনিজ মেডিসিন বা টিসিএম-কে, (আকুপাংচার যার অংশবিশেষ) নিয়ে কি বিপুল কর্মকাণ্ড চলছে এবং তা ক্রমবর্ধমান। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের আকুপাংচার হাসপাতালেও শতাধিক রোগী ভর্তি, প্রতিদিন কয়েকশো রোগীর চিকিৎসা চলছে। এ প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে। তবে ঐ হাসপাতালের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণের মতো মনে হল আশা বিহারকে, যদিও আশা বিহারের ব্যবস্থাপনা তুলনায় অনেক অনেক কম।

ঝাড়খণ্ড-পশ্চিমবঙ্গের সীমানা ঘেঁষা, আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় এই আশা বিহার আসলে হাসপাতাল চত্বরটির নাম। হাসপাতালটির নাম 'জোহর হাসপাতাল'। স্থানীয় ভাষায় 'জোহর' শব্দটির অর্থ নমস্কার বা স্বাগত। এখন থেকে ২০ বছর আগে ক্লডিয়া মেচেল নামে এক মানবতাবাদী সমাজসেবী জার্মান মহিলা, চীন থেকে চার বছরের আকুপাংচার প্রশিক্ষণ নিয়ে ফিরে, পুরুলিয়া জেলার প্রান্তিক দরিদ্র এলাকায়, একটি আধা-ধর্মীয় সংগঠনের ছায়ায় আকুপাংচার কেন্দ্রিক সেবামূলক কাজ শুরু করেন। (অনেকটা পশ্চিমবঙ্গে ডাঃ কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটির মতো, যদিও এর সৃষ্টির ইতিহাস ও আদর্শগত ভিত্তি আলাদা।) কিন্তু মহিলা বলে তাঁকে ঐ সংগঠনের এলাকার মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হয় নি। (সাধুদের চিত্তবৈকল্যের ভয়!) ঐ সংগঠনের 'সাধুদের' সঙ্গে ব্যক্তিত্বের কিছু সংঘাত ও মতানৈক্যও হয় (অন্তত প্রাথমিকভাবে যতটুকু জেনেছি)। এরপর তিনি নিজের আদর্শ বজায় রেখে, ঐ সংগঠনের ছত্রছায়া থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে এসে স্বাধীনভাবে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। খুঁজতে খুঁজতে আশা বিহারের বর্তমান জায়গাটি পছন্দ হয়। জার্মানির সমমনস্ক আরও কিছু বন্ধুদের নিয়ে জার্মানিতে গড়ে তোলেন 'জোহর গেসেলশ্যাফট' (অর্থাৎ জোহর সোসাইটি) নামে সংস্থা। মূলত তার নিয়ন্ত্রণে এখানে তৈরি হয় পিসবার্ড সোসাইটি এবং তারই অধীনে আশা বিহারের এই জোহর হাসপাতাল। জার্মানি ও অন্য কিছু দেশের বন্ধুবান্ধবদের আর্থিক অনুদানে জায়গাটি কিনে গড়ে তোলেন বর্তমান হাসপাতাল ও অন্যান্য বাড়িঘর ১৯৯৫-৯৬ সালে। হাসপাতাল ছাড়া, পাঁচিলঘেরা আশা বিহার চত্বরে আছে প্রায় ৩০জন অনাথ, অতিদরিদ্র আদিবাসী ছেলেমেয়েদের থাকার জায়গা 'মাড হাউস' (তবে মাটির বাড়ি আদৌ নয়)। এইসব বাচ্চাদের থাকা-খাওয়া, পড়াশোনা, জামাকাপড়, চিকিৎসা সবকিছুরই ব্যবস্থা করে আশা বিহার। আছে কমপিউটার পড়ানোর জন্য বাড়ি, বিদ্যালয় ভবন, কিছু কর্মীর কোয়ার্টার (যার একটি একাকী আমার বাসস্থান), ঐ ছেলেমেয়েদের ও আমাদের মতো কর্মীদের রান্না-খাওয়ার জায়গা। আর আছে মতি নামে একটি ঘোড়া (আগে ছিল ময়ূর, সে উড়ে গেছে জঙ্গলে)।

প্রতিষ্ঠাত্রী ক্লডিয়া মেচেল ভারতীয় নাম নিয়েছেন কল্যাণীকা (সবার কল্যাণীকাদি)। উনি শুরু থেকেই স্থানীয় বেশ কিছু, মূলত আদিবাসী তরুণ-তরুণীকে আকুপাংচার প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন। অনেকটা আগেকার চীনের বেয়ারফুট ডক্টরের ধাঁচে। ধীরে ধীরে এরাই তাঁর অধীনে আকুপাংচার চিকিৎসা শুরু করে। তিনি এখন মূলত থাকেন জার্মানিতে। তাঁর এই সব ছাত্রছাত্রীরা দক্ষতার সঙ্গে স্বনির্ভরভাবে চিকিৎসা করে চলেছে এবং আশা বিহারকে বিখ্যাত করে তুলেছে। (পশ্চিমবঙ্গে সরকারি স্বীকৃতির পর আকুপাংচার কাউন্সিল গড়ে উঠলে তার অধীনে আইনত পার্ট-বি রেজিস্টার্ড আকুপাংচার চিকিৎসক হিসেবে এদের তৈরি করা ও পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করার উদ্দেশে বছর দশ বারো আগে এদের পড়াতে বার কয়েক ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রিত হয়ে আমার এখানে আসা হয়েছিল।) আশা বিহারের খ্যাতি এমনই যে, ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন জেলা থেকে তো বটেই, বিহার উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গা থেকেও এখানে রোগী আসেন। টিটাগড়ের এক কারখানার শ্রমিক বা কলকাতার নিউমার্কেটের এক ব্যবসায়ী এখানে এসে জানলেন কলকাতাতেও আকুপাংচার ভালভাবেই হয়। আর এত বিচিত্র ধরনের রোগী– যেমন, শিশুদের একদিকের পক্ষাঘাতের রোগী মেডিক্যাল কলেজেও একসঙ্গে এতজন দেখতে পাই নি। আরো কত বিরল রোগ। সবই প্যারালিসিস আর ব্যথা সংক্রান্ত।

জায়গাটা এমনিতে দুর্গম। নিকটতম বাস রাস্তা দু-তিন কিলোমিটার দূরে চিলগাড্ডা গ্রামে, যেখানে দিনে একবার পুরুলিয়ার বাস যাতায়াত করে। বোকারো স্টিল সিটি রেলওয়ে স্টেশন ৩০ কিলোমিটার দূরে। আশা বিহারের ভাড়া গাড়ি পাওয়া যায়। তবে ৪০০-৫০০ টাকা নেবে। নাহলে ট্রেকারে করে জায়না মোড়, ওখান থেকে আশা বিহারগামী আলাদা ট্রেকার। দিনে ৩-৪ বার বড় জোর যাতায়াত করে। ঠাসা ভিড় না হলে ছাড়ে না। রাস্তায় কোনো যাত্রী হয়ত লাউ বা শাক কিনবে বলে দাঁড়াতে হয়। তাই অধিকাংশ রোগীর বাড়ির লোকজন দিনে রাতে নানা সময় কয়েক হাজার টাকার গাড়ি ভাড়া করে বা ব্যক্তিগত গাড়িতেই আসেন। ছোটখাটো পাহাড়-টিলা ডিঙিয়ে প্রায় নির্জন পথ।

আশা বিহার চত্বরে মাছমাংস ডিম এবং ধূমপান খৈনি গুটকা ইত্যাদি নিষিদ্ধ। ভর্তির জন্য রোগীদের থেকে নেওয়া হয় ছ' দিনের জন্য ৫০০ টাকা। এর মধ্যেই থাকা ও আকুপাংচার চিকিৎসা। বিছানা নিজেদের আনতে হয়। সঙ্গে যে থাকবে তার জন্য দিনে ১০ টাকা করে। দুটো ছোট খাবারের দোকান আছে, রোগীরা ওখানেই খাওয়ার ব্যবস্থা করে। এছাড়া ছোট ছোট ঘর আছে, যেখানে রোগীর বাড়ির লোকজন ছোট গ্যাস এনে নিজেরা রান্না করতে পারে। পাঁচিলের বাইরে আছে ঝুপড়ি দোকান, যেখানে মাছমাংস ডিম পাওয়া যায়। এছাড়া আশপাশে কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে কোনো দোকানপাট নেই।

আমাদের দেশের বেসরকারি হাসপাতালে কেমন টাকা নেয়, তা আমরা জানি। চীনে যে 'দ্য ফার্স্ট হসপিটাল অভ হুনান ইউনিভার্সিটি অভ চাইনিজ মেডিসিনে', যেখানে আমরা গিয়েছিলাম, তিন দিনের ভর্তির জন্য নেয় ৫০০ ইউয়ান অর্থাৎ প্রায় ৫০০০ টাকা। প্রতিদিন আউটডোরে চিকিৎসার জন্য ২০০ ইউয়ান অর্থাৎ প্রায় ২০০০ টাকা। অবশ্য সব রোগীরই বিমা আছে, তাই এই খরচের বড় অংশই সরকার থেকে পেয়ে যায়। চীনের বড় শহরের বড় সরকারি হাসপাতালে খরচ কলকাতার নামী প্রাইভেট হাসপাতালের মতো। তবে ব্যবস্থাদি অতি উন্নত। গ্রামাঞ্চলে খরচ কিছু কম। তবে আয়োজনও কম। প্রসঙ্গত জানা গেল, এখনকার চীনে আর্থিক বৈষম্য বেড়েছে ও বাড়ছে। তবে ভারতের মতো দারিদ্র্যসীমার নীচের মানুষ প্রায় নেই (হয়ত প্রত্যন্ত এলাকার গ্রামে আছে)। পেইচিং, চাংশা, শিজিয়াছুয়াং— যে তিনটি শহরে প্রথমে যাওয়া হয়েছিল ওখানে দেখি নি, কিন্তু সাংহাইতে প্রথম ভিখারি দেখলাম। জনারণ্য নানজিন রোডের ধারে, দার্জিলিঙের ম্যালের মতো একটি ফাঁকা জায়গায় একটা হাত পঙ্গু মধ্যবয়সী এক বলিষ্ঠ পুরুষকে হাত পেতে ভিক্ষে চাইতে দেখলাম। তাঁর পোশাক ও চেহারা কিন্তু আমাদের দেশের টিপিক্যাল ভিখারির থেকে অনেক ভাল। (ভিক্ষে দেওয়ার ভাল-মন্দ যাই হোক না কেন, চীনে দেখা প্রথম ভিখারিকে 'ভিক্ষে' দেওয়ার লোভ সামলানো গেল না; ভারত থেকে যাঁরা গিয়েছিলাম, তাঁদের মধ্যে আমার ইউয়ানের ভাণ্ডার সর্বনিম্ন হলেও, বেশ দরাজ হাতে এক ইউয়ান অর্থাৎ প্রায় ১০ টাকা তাঁকে দিলাম!) সাংহাইতে আরও একজন মলিন পোশাকের ভ্রাম্যমাণ ভিখারিকেও দেখলাম। সাংহাইয়ের রাস্তায় দেখলাম, ভ্রাম্যমাণ এক বৃদ্ধা জুতো পালিশওয়ালাকে। জোর করে আমার জুতোয় ক্রিম লাগিয়ে পালিশের জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন। দাম পড়বে ১০-১৫ ইউয়ান অর্থাৎ ১০০-১৫০ টাকা। করাই নি। কিন্তু দৃশ্যটা ভোলার নয়। এরই পাশাপাশি বিশাল বিশাল অট্টালিকা, ভিড়ে ঠাসা দামি বেস্তোরাঁ, ব্যবসা কেন্দ্র; দুবাইয়ের পর এখানেই পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম বাড়ি — ১২৮ তলা 'সাংহাই ওয়ার্ল্ড সেন্টার'। শহরে ফ্ল্যাটের দাম বেশ কয়েক কোটি (৩-১০) টাকা। যাই হোক, প্রসঙ্গান্তরে বেশি না যাওয়াই ভাল।

আকুপাংচার বলতে চীন বোঝালেও, চীনের অধিকাংশ মানুষই কিন্তু আকুপাংচার করান না, বা করার প্রয়োজন হয় না। এখন ওয়েস্টার্ন মেডিসিন বা আধুনিক চিকিৎসার সর্বোচ্চ ব্যবস্থাদিতেও চীন সমৃদ্ধ। কিন্তু এর আগেও স্বাভাবিক কারণেই চীনের সবার যে আকুপাংচার চিকিৎসার দরকার হত, তাও নয়, কারণ আকুপাংচার আসলে টিসিএম-এর একটি অংশ, যার বড় অংশ জুড়ে আছে হার্বাল মেডিসিন, ছিকুং নামক ব্যায়াম, টুইনা নামের ম্যাসাজ ইত্যাদি। পূর্বোক্ত যে হাসপাতালটিতে আমরা বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছিলাম, সেটি ২৫ তলা এবং এক একটি অংশে ওয়েস্টার্ন মেডিসিন ও সার্জারির সুপার স্পেশালিস্ট অজস্র বিভাগ— তা সে শুধু মলাশয়ের জন্য প্রোক্টোলজি বিভাগই হোক বা মায়ের বুকের দুধের জন্য ল্যাকটোজেনিক বিভাগই হোক অথবা নিওনেটাল সার্জারি, জেরিয়াট্রিক বিভাগই হোক।। নিউরোসার্জারি-কার্ডিও থোরাসিক সার্জারি ওগুলো আছেই। এই হাসপাতালের তিনটি তলা শুধু আকুপাংচার (ওটিসিএম)-এর জন্য। শুধু এই তিনটি তলার মোট যে পরিসর তা মনে হল কলকাতার যে কোনও মেডিক্যাল কলেজের পুরো এলাকার চেয়ে বেশি। এবং তা ভিড়ে ঠাসা, নানা ঘরে আকুপাংচার ও সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা করা হচ্ছে (তার

বিস্তারিত বিবরণের সুযোগ এখানে নেই)। কোথাওমেঝেতে এতটুকু তুলো বা কাগজের টুকরো, প্লাস্টিক বা ঠোঙা পড়ে নেই।

চিলগাড্ডার আশা বিহারেও কিন্তু পারিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ওপর খুব জোর দেওয়া হয়। কলকাতার ঝাঁ-চকচকে পাঁচতারা হাসপাতালের মতো বৈভব না থাকলেও, হাসপাতালের ভেতরটি যেমন, তেমনি চারপাশ বড় বড় গাছে ঢাকা পুরো চত্বরটি চেষ্টা করা হয় পরিষ্কার রাখার। একই সঙ্গে পরিষ্কার রাখার কথা বলা হয় কর্মীদের মনও; রোগীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার থেকে শুরু করে কারও কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে টাকা না নেওয়া– কঠোরভাবে মেনে চলার কথা বলা হয়। অন্যদিকে আশা বিহারে আছে পরিবেশবান্ধব সৌরবিদ্যুতের ব্যাপক ব্যবহার। চীনে একটি-দুটি হাসপাতালের বেশ কিছু চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের দেখলাম, সবার মুখেই একটি প্রসন্নতা ও হাসি; অন্তত আমাদের এখানে যেমন 'বড় বড়' ডাক্তাররা অনেকেই গ্রাম্ভারি আর অতি বিজ্ঞের মতো মুখ করে অন্য জগতের মানুষ বলে নিজেদের মনে করেন, তেমন তো নয়ই। উল্টোদিকে যেমন দেখেছি ভেলোরের ক্রিশ্চান মেডিক্যাল কলেজে, এক সার্জেন-প্রফেসর রোগীর ট্রলি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন। ঐ ধরনের মানসিকতা চীনেও দেখা গেল।

> যে হাসপাতালটিতে আমরা বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছিলাম, সেটি ২৫ তলা এবং এক একটি অংশে ওয়েস্টার্ন মেডিসিন ও সার্জারির সুপার স্পেশালিস্ট অজস্র বিভাগ। এই হাসপাতালের তিনটি তলা শুধু আকুপাংচার (ওটিসিএম)-এর জন্য। এই তিনটি তলার মোট যে পরিসর তা মনে হল কলকাতার যে কোনও মেডিক্যাল কলেজের পুরো এলাকার চেয়ে বেশি। এবং তা ভিড়ে ঠাসা।

আশা বিহারেও জার্মানি থেকে আসা পরিচালকদের পক্ষ থেকে যেমন, তেমনি স্থানীয়ভাবেও এই ধরনের রোগীবান্ধব মানসিকতার কথা বলা হয়। হুনানের চাংশার হাসপাতালে আমরা সেই অর্থে হতদরিদ্র রোগী দেখি নি (এছাড়া আমরা গিয়েছিলাম 'সাংহাই ইউনিভার্সিটি অভ ট্র্যাডিশনাল চাইনিজ মেডিসিন'-এ)। কিন্তু আশা বিহারে দরিদ্র রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি। শুরুতে গরিবদের জন্য করা হলেও, এখন চিকিৎসার জন্য বহু সচ্ছল ধনীরাও এখানে আসেন। কিন্তু সবার জন্য একই ব্যবস্থা। তবে খুব গরিবদের জন্য একেবারে বিনামূল্যে চিকিৎসা, ওষুধ, এমনকি ভর্তিরও ব্যবস্থা করা হয়।

চীনের মানুষকে এখন সর্বোন্নত আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেও, বিশেষ যে সব রোগে এই চিকিৎসার সীমাবদ্ধতা আছে এবং বিশেষ যে সব রোগে আকুপাংচার (ওটিসিএম) কার্যকর বা সহযোগী হিসেবে ব্যবহার করলে বেশি উপকার পাওয়া যায়, সে সব ক্ষেত্রে খোলা মনেই তার প্রয়োগ করা হয়। ঐ হাসপাতালের একটি বিশাল তলা শুধু 'ডিপার্টমেন্ট অভ ইন্টিগ্রেশন অভ টিসিএম উইথ ওয়েস্টার্ন মেডিসিন'-এর জন্য। এটিকে চীনের চিকিৎসাব্যবস্থার সামগ্রিক মানসিকতার একটি প্রতীক হিসেবে গণ্য করা যায়। (আশা বিহারেও এই ইন্টিগ্রেশন বা সংযুক্তির যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়।) চীনের ২৩টি প্রদেশে তো বটেই কোনো কোনো প্রদেশে একাধিক আকুপাংচার তথা টিসিএম-এর বিশাল বিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান হাসপাতাল এবং তাদের অধীনে কলেজ, ছোট হাসপাতাল আছে। চাংশা (হুনান প্রদেশের রাজধানী) ও সাংহাইতে যে দুটি এমন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা গিয়েছি, তাদের বিপুল বিস্তার, ব্যবস্থাপনা, আধুনিক গবেষণার ব্যবস্থা, রোগীর ভিড়— এসব দেখে পুরো দেশের এ ব্যাপারে মানসিকতাটিকে ধরা যায়। বিদেশ থেকে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী পড়তে এসেছে। পাকিস্থান ও আমেরিকার কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হল।

অথচ পাশাপাশি আমাদের দেশে আয়ুর্বেদের কি অবস্থা! আয়ুর্বেদ ওষুধ কোম্পানির হাজার হাজার কোটি টাকার ব্যবসাই এখানে সার। আর ভারতে পশ্চিমবঙ্গের মতো সবেধন নীলমণি যে রাজ্যে সরকারিভাবে আকুপাংচার কাউন্সিল ও সব জেলা হাসপাতাল সহ কিছু আকুপাংচার বিভাগ আছে, তা ঔদাসীন্যে কোনোরকমে শ্বাস টিকিয়ে রাখার মতো। অন্যান্য রাজ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে আকুপাংচার চিকিৎসক আর্থিক ব্যবসাই ভাল বোঝেন। তার পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডের মতো ঐ রাজ্যের একটি প্রত্যন্ত এলাকায় কোনো সরকারি অনুকূল্য ছাড়া শুধু সেবামূলক মানসিকতার সঙ্গে কিছু পেশাদারিত্বের মিশ্রণে আশা বিহার

আকুপাংচারের মতো স্বল্প ব্যয়ের, সহজ সরল অথচ দুরারোগ্য বিশেষ ক্ষেত্রে কার্যকর চিকিৎসাকে হাজার হাজার মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। (প্রতি বছর গড়ে এখানে নতুন রোগী আসে প্রায় চার হাজার।)

কোনো ধর্মীয় পরিমণ্ডল না থাকলেও, আশা বিহারের পরিবেশ অনেকটা আশ্রমের মতো। গাছে গাছে ভরা বিরাট চত্বরে বাচ্চাদের দোলনাও যেমন আছে, তেমনি আছে বসার ও ঘোরার জায়গা। ঠিক গায়েই আছে ছোট্ট একটা নদী, যার স্থানীয় নাম দরদা নদী। চারদিকে তো পাহাড়ি ফাঁকা জায়গা আছেই। অনেকে মনে হয়, চিকিৎসার পাশাপাশি এমন নির্মল পরিবেশের আকর্ষণেও আসে, কিছুদিন শহর বা ঝুপড়ির থেকে বেরিয়ে খোলা জায়গায় কাটিয়ে যাওয়া সুন্দর একটা 'চেঞ্জ'।

এরই পাশাপাশি চীনের যে হাসপাতালের বিশাল আকুপাংচার বিভাগ দেখার সুযোগ হল, তার সঙ্গে চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যাপারে আশা বিহারের বেশ কিছুটা মিল দেখা গেল, যা ভারতের কিছু জায়গা থেকে কিছুটা আলাদা (সংক্ষেপে বললে আকুপাংচারের কিছু নির্বাচন, প্রতি রোগীকে সামনে পেছনে দুবার আকুপাংচার করা, মক্সিবাশ্চান-কাপিং-এর ব্যবহার, ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলেশন প্রায় না দেওয়া, ফিজিওথেরাপির ব্যবহার ইত্যাদি। যার বিস্তারিত বিবরণের সুযোগ এখানে নেই)। এই মিলের ধারণাটিকে কেউ কেউ বাড়াবাড়ি বা আবেগের আতিশয্য মনে করলে কিছু করার নেই। বাস্তবে তা অনুভব করা যায় এবং তা প্রতিষ্ঠাত্রী ক্লডিয়া মেচেলের চার বছরের চীনে পড়ার ঠিক পরেই এখানে শুরু করা, অন্যদের শেখানো, তার জন্য হতেই পারে।

যাই হোক , আশা বিহারের সব কর্মীই (প্রায় ১০০ জন) স্থানীয় এবং বেশিরভাগই আদিবাসী গোষ্ঠীর। হাঁসদা, সোরেন, হেমব্রম, মর্মু, মাহাতো, বেসরা, ঘাঁসি থেকে গরাই, গোপ, মণ্ডল। সবাই মাইনে পান, কিন্তু আহামরি কিছু নয়। রান্নার বা পরিষ্কার করার কাজ যাঁরা করেন, তাঁদের সঙ্গে চিকিৎসার বা ফিজিওথেরাপির চিকিৎসকদের সম্পর্ক সম্পূর্ণ বন্ধুত্বের এবং তা নিছক কথার কথা নয়। তফাত আছে কিছু মাইনেয় এবং পোশাকে; চিকিৎসাকর্মীদের পোশাক সম্পূর্ণ সাদা। এমনকি জার্মানি থেকে এলেও তাঁরা থাকেন অতি সহজ সরলভাবে। একই সঙ্গে বাচ্চাদের সঙ্গে বসে নিরামিষ খান, শুধু থাকে শৃঙ্খলারক্ষার ক্ষেত্রে কঠোরতা। চীনের ঐ হাসপাতালেও অনুভব করা গেল অধ্যাপক থেকে সাধারণ কর্মী— সবার মধ্যে সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্ক। কি পোশাকে, কি ব্যবহারে।

আশা বিহারের আরেকটি দিক হল আশপাশের (অর্থাৎ ৮-১০ কিলোমিটার দূরে) দরিদ্র গ্রামাঞ্চলে নিয়মিতভাবে প্রতি সপ্তাহে বিনামূল্যে আকুপাংচার, হোমিওপ্যাথি ও অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। এছাড়া আছে প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে অস্ত্রোপচার শিবির। জার্মানি থেকে আসা স্বেচ্ছাসেবী অস্থিবিশেষজ্ঞ ও মেডিক্যাল টিম হাড়ের জন্মগত ত্রুটিযুক্ত বাচ্চাদের অস্ত্রোপচার করেন। খাওয়া খরচ ছাড়া, থাকা, অস্ত্রোপচার চিকিৎসা ইত্যাদি সবকিছুই প্রায় বিনামূল্যে।

জীবনের শেষ প্রান্তে, কলকাতার সরকারি হাসপাতাল থেকে অবসর নিয়ে, আশা বিহারে আবাসিক একমাত্র 'অ্যালোপ্যাথি' চিকিৎসক ও আকুপাংচার প্রশিক্ষক হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে পেয়েছি (অন্তত এখনো অবধি) বন্ধুত্ব, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। অদ্ভুত ব্যাপার, চীনে গিয়ে যাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ হল এবং প্রতি শহরের দোভাষী— সবার কাছ থেকেই আমরা সবাই অনুভব করলাম আন্তরিক বন্ধুত্বের মানসিকতা। কুনসিং বিমানবন্দরে দেরি হওয়ার জন্য এক বিমানকর্মী তরুণী আমাদের অসুস্থ একজনের ব্যাগ টেনে নিয়ে দীর্ঘ পথ ছুটতে ছুটতে আমাদের যেভাবে পেইচিং-এর বিমান ধরালেন, সে ছবি ভোলা যায় না। এই ধরনের প্রসন্ন সহযোগিতা চীনের যেখানে গিয়েছি আমরা পেয়েছি। সার্থকভাবেই চীনের গেটওয়ালের সামনে একটি ফলকে লেখা আছে, 'একসময় এর উদ্দেশ্য ছিল বিদেশের শত্রুদের আক্রমণ আটকানো। এখন এটি পৃথিবীর বহু মানুষকে একত্রিত করছে। এই মহাপ্রাচীর বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে যুগ যুগ ধরে কাজ করে চলুক।' আর এরই প্রতিধ্বনি ছিল, আমাদের যাত্রার প্রাক্কালে কলকাতার সল্টলেকে চীনা কনসাল জেনারেল মা চাং উ-এর কণ্ঠে। তিনি বলেছিলেন, একসময় আকুপাংচার শুধু চীনের অসংখ্য মানুষকে সেবা করেছে; এখন তা পৃথিবীর বহু দেশের কোটি কোটি মানুষের সেবায় লাগছে; আকুপাংচারকে কেন্দ্র করে চীনের সঙ্গে এক আন্তর্জাতিক মৈত্রীর পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে। ভারত থেকে এবার যাওয়া এই প্রথম এত বড় আকুপাংচার চিকিৎসক দলের চীন যাত্রাকে ঐতিহাসিক হিসেবে বর্ণনা করে তিনি বলেন, ভারত-চীন মৈত্রী ও আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে আকুপাংচার অন্যতম সেতু। আশা বিহার যেমন কিছুটা মিলিয়েছে জার্মানি ও ভারতের ঝাড়খণ্ডকে। সেতু সেই আকুপাংচার।

উমা

চিঠি ১

আকুপাংচারের বিজ্ঞান নিয়ে বিতর্ক

মাননীয় সম্পাদক,
উৎস মানুষ

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬ সংখ্যায় আমার 'বিশ্বাসে মিলায়' প্রবন্ধের প্রেক্ষিতে পরবর্তী সংখ্যায় ডাঃ ভবানীপ্রসাদ সাহুর উত্তরে আমার এই সবিনয় নিবেদন।

প্ল্যাসিবোর বাংলা কী হবে, আকুপাংচার কোথায় প্রথম প্রচলন হয়েছিল, এগুলো অপ্রয়োজনীয় অবশ্যই নয়। তবে আকুপাংচারের বিজ্ঞানভিত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করা অনেক বেশি প্রয়োজনীয় বলে আবার কলম ধরতে হল।

ডাঃ সাহু তাঁর মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময়ের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আকুপাংচারের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেনঃ১) 'এটিকে ঠিক প্ল্যাসেবো বলে মনে হয় নি',... ২) 'অধ্যাপক ডাঃ সুব্রত ব্যানার্জি মন্তব্য করেছিলেন...', ৩) 'এই সব রোগীর কারো ক্ষেত্রেই ব্যাপারটিকে প্ল্যাসিবো মনে হয় নি'।

অবিজ্ঞানী, অচিকিৎসক এমন একজনের উক্তি এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে মনে পড়ে গেল— 'যাকে বলি বিজ্ঞান, সায়েন্স, তার প্রধান লক্ষণ হচ্ছে জ্ঞানের জন্য অপরাজিত যত্ন। কোথাও আন্দাজ খাটবে না, খেয়ালকে মানবে না, বলবে না 'ধরে নেওয়া যাক', 'সর্বজ্ঞ ঋষি এই কথা বলে গেছেন।' (জাভা-যাত্রীর পত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ডাঃ সাহু লিখেছেন, '...ব্যথা-বিশেষজ্ঞ মেলজাক-ওয়ালের **আকুপাংচারের সাহায্যে** ব্যথা কমানোর ক্ষেত্রে গেট কন্ট্রোল মেকানিজম, স্পাইনাল কর্ডের সেগমেন্টাল যোগাযোগ, এসবের ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।' (নজরটান এই পত্রলেখকের)

প্রকৃত তথ্য কিন্তু বলছে মেলজাক-ওয়ালের তত্ত্ব গত শতাব্দীর ষাটের দশকের, বিজ্ঞানীরা আকুপাংচার নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করার বছর দশেক আগেই। মেলজাক-ওয়ালের তত্ত্ব সাধারণভাবে ব্যথা উপশম নিয়ে। শ্রী সাহু **আকুপাংচারের সাহায্যে** ব্যথা কমানোর ক্ষেত্রে বলায় বিভ্রান্ত বোধ করছি। উপরন্তু গুরুত্বপূর্ণ হল গেট কন্ট্রোল তত্ত্ব অন্য ক্ষেত্রে কার্যকর বলে প্রমাণিত হলেও এই তত্ত্ব আকুপাংচারে কাজে লেগেছে, এ প্রমাণ এখনও অধরা।

আকুপাংচার শরীরের মধ্যে জৈব-রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়— কোন সর্বজনগ্রাহ্য গবেষণায় এটা প্রমাণিত ডাঃ সাহু তার বিশদ জানালে পাঠকের সুবিধা হত।

পশুদের ক্ষেত্রে আকুপাংচার প্রয়োগ করে তিনি প্ল্যাসিবোর প্রভাব থাকার সম্ভাবনা নেই বলে মন্তব্য করেছেন। রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে প্রমাণ করলেন যে, অনাক্রম্য সাড়া (immune response) দেওয়াকেও 'সৃষ্টি হওয়া অবস্থা'য় (condition) নিয়ে যাওয়া যায়। গিনিপিগের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখলেন খুব অল্প মাত্রায় বিষযুক্ত সামান্য রাসায়নিক তাদের শরীরে ইঞ্জেকশন দিয়ে প্রবেশ করালে তাদের শরীরে বিভিন্ন লাল দাগ দেখা দেয়। ইঞ্জেকশন দেবার আগে গিনিপিগের শরীরের ওপর যিনি ইঞ্জেকশন দিচ্ছেন তিনি কিছুটা চুলকে নিতেন। পরবর্তী পরীক্ষায় দেখা গেল তাদের শরীরের ওপরে কেবল চুলকোলেই (ইঞ্জেকশন না দিয়ে) গিনিপিগের শরীরে লাল দাগ দেখা দেয়। অর্থাৎ প্রাণীদের ক্ষেত্রে প্ল্যাসিবো কাজ করে না এ কথাটা ঠিক নয়।

এবার বোধহয় আকুপাংচারের মধ্যে বিজ্ঞান খোঁজার চেষ্টা করা যেতে পারে। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল প্ল্যাসিবোর পরীক্ষা। ১৯৭৯-এ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) আকুপাংচার নিয়ে এক রিপোর্ট প্রকাশ করে। আন্তঃ আঞ্চলিক এক আলোচনাচক্রের সিদ্ধান্ত মেনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আর এইচ ব্যানারম্যানকে আকুপাংচারের সবদিক

বিচার করে এক রিপোর্ট তৈরি করতে বলেন। প্রকাশিত রিপোর্ট আকুপাংচারের জয়গানই গাইল এবং বলল আকুপাংচার চিকিৎসা প্ল্যাসিবো-নির্ভর নয়।

আবার ২০০৩ সালে হু-এর আর এক রিপোর্ট মোটামুটি ১৯৭৯-এর প্রতিধ্বনি। ১৯৭৯-তে হু-এর রিপোর্ট যেমন কোনো সমালোচনার সম্মুখীন হয় নি এবারে কিন্তু মারাত্মক এবং ক্ষতিকর গলদ ধরা পড়ল। গলদ প্রধানত এর পদ্ধতি নিয়ে। সমালোচিত হল এইভাবে যে, হু অন্যান্য আধুনিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে যতটা যত্নবান ও বিজ্ঞানপ্রবণ বিকল্প চিকিৎসার ব্যাপারে ঠিক ততখানিই রাজনৈতিক চাপের কাছে মাথা নত করে। হু-র যদি এই অবস্থা হয় তখন মানুষ কার ওপর আস্থা রাখবে? ডাক্তারদের সাহায্য করার জন্য যে প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হল তার নাম The Cochrane Collaboration । বহু দেশে শাখাপ্রশাখা নিয়ে এর বিশাল কর্মধারা এবং এর বিশ্লেষণ বিজ্ঞানসম্মত হওয়ায় প্রতিষ্ঠান হিসাবে সবারই আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। The Cochrane Collaboration-র গবেষণা ও বিশ্লেষণের ফলস্বরূপ এক দীর্ঘ রোগের তালিকা দিয়ে দেখাল যেগুলোর ক্ষেত্রে আকুপাংচার একেবারেই কার্যকর নয়। সামান্য কয়েকটি ব্যথার উপশমের ব্যাপারে কার্যকর বলাটাতেও জোরের অভাব। এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই পরীক্ষার গলদের উল্লেখ করেছে।

এই গলদ দূর করার অভিপ্রায়ে জার্মানি ও অন্যান্য দেশে প্রচেষ্টা শুরু হল সূচ ফোঁটানোর যন্ত্রের উন্নতরূপ উদ্ভাবনের যাতে প্ল্যাসিবোর পরীক্ষাটা আরো ত্রুটিমুক্ত হয় অর্থাৎ দ্বিগুণ অন্ধতা পূর্ণতা পায়। অধিকতর উন্নত হল এ কথা সত্য কিন্তু একথা মানতেই হবে অন্যান্য ওষুধের ক্ষেত্রে যেটা সম্ভব আকুপাংচারে যিনি সূচ ফোটাচ্ছেন তাঁকে ব্যাপারটা নিয়ে অন্ধকারে রাখা সম্ভব নয়।

আকুপাংচার প্ল্যাসিবো-মুক্ত এ কথাটা প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞান তাকে মানবে কেন?

ডাঃ সাহুকে ধন্যবাদ আমাদের সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য যে, '...প্রকৃত বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ জানেন, এখনও আমাদের অনেক কিছু জানা নেই...।'

নমস্কারান্তে
সুব্রত ঘোষ

চিঠি ২

আকুপাংচারের পক্ষে শ্রদ্ধেয় ডাঃ ভবানীপ্রসাদ সাহুর বক্তব্যটি আমাকে কিঞ্চিৎ অস্বস্তিতে ফেলায় আমার নীচের প্রতিবেদনটি নিবেদন করছি।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন হয়েছিল বলে মনে করা হয়। কোনো ব্যক্তি তাঁর জীবনদর্শনে, দৈনন্দিন কাজেকর্মে , তাঁর পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের চেতনার বিশ্লেষণে, তাঁর মননে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণ করতেই পারেন। তাঁর সেই অনুসরণের একটা মাত্রা থাকাও স্বাভাবিক। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি তাঁর চিন্তায় ও কর্মকাণ্ডে আংশিক বা প্রায় সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও একটি চেতনা ও কর্মপদ্ধতি মাত্র, যেটা ব্যক্তিগত, মানবিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবমুক্ত। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যে ১) সঙ্ঘবদ্ধ নিরীক্ষণ ২) পরিমাপ ৩) পরীক্ষানিরীক্ষা ৪) জাগতিক ঘটনার সাধারণ সূত্র অনুমান ও তার পরখ ৫) অনুমানভিত্তিক জাগতিক সূত্রের (হাইপোথিসিস) প্রমাণ, বর্জন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখযোগ্য। তবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শক্তির অনিত্যতায় সমালোচনার আগুনে পক্ক না হলে বিজ্ঞান দৃঢ় হয় না। ব্যক্তিবিশেষের বা কোনো বিশেষ মতাদর্শে বিশ্বাসী গোষ্ঠীর ধারণা, অনুমান, অভিমত ও অভিজ্ঞতার কোনো আবেদন বিজ্ঞানকে পুষ্ট করে না।

আকুপাংচার (অন্ততপক্ষে) উপরে উল্লিখিত তিন, চার ও পাঁচ নম্বরের বৈশিষ্ট্যগুলো মান্য করে না। কিছু চিকিৎসক একটা চিকিৎসারীতি উদ্ভাবন করলেই সেটা বিজ্ঞানের মান্যতা পায় না। তাই রোগমুক্তি হল বা রোগের উপশম হল বললেই বা প্রদর্শন করলেই চলে না। চাই তার যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা, রুগী ও চিকিৎসক নিরপেক্ষ পরীক্ষার ও সফলতা প্রদর্শন। যেহেতু চিকিৎসাবিজ্ঞান জৈবিক ক্রিয়া নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করে, আর জৈবিক ক্রিয়া অনেক অল্প জানা বা অজানা বৈশিষ্ট্যের উপরে নির্ভরশীল, তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ে কাকতালীয় সমাপতনের সম্ভাবনার ঊর্ধ্বে কার্যকারণ সম্ভাবনা প্রমাণ করা। এইখানে সংখ্যাতত্ত্বের বিশ্লেষণের (স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস) উপরে চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণা গভীরভাবে নির্ভরশীল।

সায়াটিকায় আকুপাংচার চিকিৎসায় সম্পূর্ণ কষ্টমুক্ত হওয়া প্ল্যাসিবো বলে মনে হয় নি বা সার্জারির অধ্যাপক বার্জারস ডিজিজে আকুপাংচারই দ্য বেস্ট ট্রিটমেন্ট বলেছেন বললেও বৈজ্ঞানিকভাবে কিছুই প্রমাণ করা যায় না। এখানে উপরে উল্লিখিত পাঁচটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির একটিও মান্য করা হয় না।

নিবন্ধটিতে কয়েকটি পরীক্ষাগারের পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে। আকুপাংচারের দ্বারা বিড়ালের রক্তক্ষরণজনিত 'শক' নিবারণের ও খরগোশের 'পেইন থ্রেশোল্ড' বাড়ানোর পরীক্ষায় আকুপাংচারের কর্মপদ্ধতির ব্যাখ্যার অভাব (অনুমানভিত্তিক জাগতিক সূত্রের অভাব) আছে। 'হাঁটুর নিচে আকুপাংচারের উত্তেজনা দিলে পাকস্থলীতে তার সুপ্রভাব হবে', বৈজ্ঞানিক মনন এটারও ব্যাখ্যা চায়, নইলে আঙুলে পাথর বসানো আংটির অযৌক্তিক দাবির থেকে আকুপাংচারকে আলাদা করা যাবে না।

বিজ্ঞান ব্যক্তি বা গোষ্ঠীনির্ভর পদ্ধতি নয়। বিজ্ঞান তার স্রষ্টাকে (আধুনিক মানুষকে), তার নিয়মগুলির উদ্ভাবককে (বৈজ্ঞানিককে) প্রশ্ন করতে উদ্বুদ্ধ করে। হ্যারিসন, ডেভিডসন বা অখ্যাত গৌতম মিস্ত্রী কী বলে গেল, সেটা ধ্রুবসত্য হতে পারে না। বৈজ্ঞানিক প্রমাণ খুঁজতে হলে ব্যক্তিবিশেষ কী বললেন, সেটা প্রমাণ সাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য। ব্যক্তিবিশেষ এখানে কেবল গৌণই নয়, একেবারে নৈর্ব্যক্তিক। আকুপাংচারের সুফল ব্যাখ্যা করার জন্য নিবন্ধকার আকুপাংচারের কিছু প্রাচীন ধারণার উল্লেখ করেছেন। কোন পথে, কোন মাধ্যমে 'ছি', 'মেরিডিয়ান' বা 'ইন-ইয়াং' প্রবাহিত হয় সেটা প্রদর্শন করা না গেলে শরীরের ও ভাগ্যের উপরে মহাকাশের শনি বৃহস্পতি গ্রহের প্রভাবকেও যে বিজ্ঞান বলে মেনে নিতে হয়!

আমরা জাগতিক অনেক রহস্যের সমাধান করতে পারি নি, বিজ্ঞানের অনেক কিছু রহস্যের সমাধান করা বাকি আছে। হয়ত জাগতিক রহস্যের পুরোটা জানা কোনোদিনই সম্ভবপর হবে না। এরই সঙ্গে বিজ্ঞানের অপব্যবহার, মুনাফাচালিত বিজ্ঞান-আশ্রয়ী আগ্রাসন আমাদের শোষণও করতে থাকবে। এই অজুহাতে অবিজ্ঞানের ও অপবিজ্ঞানের সঙ্গে আপস করাটাও লোভনীয়, চটকদার, জনপ্রিয় ও ক্ষতিকর ঝোঁক। অশিক্ষিত গরিব জনগণের জন্য জনবিরোধী সরকার এই ধরনের অনেক অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা যায় নি বা উন্নত কর্মক্ষম ও প্রমাণিত চিকিৎসা প্রযুক্তি প্রয়োজনীয় রসদের অভাবে প্রয়োগ করা যাচ্ছে না, এই যুক্তিতে অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা সযত্নে পরিহারযোগ্য।

বিনীত

গৌতম মিস্ত্রী

লেখকের উত্তর

দুঃখের বিষয় উৎস মানুষ, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৭-এ আকুপাংচার প্রসঙ্গে আমার কথাগুলি পৃথিবীর এত কোটি মানুষের মধ্যে শুধু আমার ব্যক্তিগত মতামত বা আমার আবিষ্কৃত তথ্য নয়। খোলামনে একটু পড়াশোনা করলেই বিজ্ঞানের নামে কিছু যান্ত্রিক, অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের কিছু পাঠ্যপুস্তকের সাম্প্রতিক সংস্করণগুলিকে আকুপাংচারের কিছু কিছু উল্লেখও এ ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে, যা দু-এক দশক আগে থাকত না। মেডিক্যাল কলেজে আমাদের ছাত্রাবস্থার সংস্করণগুলিতে তো নয়ই, যেমন হ্যরিসন্স প্রিন্সিপলস অভ ইন্টারন্যাল মেডিসিন (ই-সংস্করণ সহ), ডেভিডসন্স প্রিন্সিপলস অ্যান্ড প্র্যাকটিস অভ মেডিসিন, গ্যানং-এ ফিজিওলজি, মেলজাক-ওয়াল-এর 'পেইন' ইত্যাদি। ইন্টারনেটেও আকুপাংচার সংক্রান্ত গবেষণার নানা তথ্য পাওয়া যাবে। এটিও মনে রাখা দরকার, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের তুলনায় আকুপাংচারের সন্দেহাতীত কার্যকারিতা যেসব ক্ষেত্রে প্রমাণিত তার সংখ্যা সীমিত (এ ব্যাপারে ওয়ার্ল্ড হেল্থ অর্গানাইজেশন বা হু-এর তালিকা দেখা যেতে পারে)। তবু মনে হয় এ ব্যাপারে বিতর্ক শেষ হবে না এত তাড়াতাড়ি।

ভবানীপ্রসাদ সাহু

বিঃ দ্রঃ জায়গার স্বল্পতার কারণেই এ বিষয়ে আর চিঠিপত্র প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

সম্পাদক

নিবেদিতা ও বিপ্লব-বিতর্ক

সম্পাদক,
উৎস মানুষ

নিবেদিতা কী প্রকৃত বিপ্লবী ছিলেন? তাঁর সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের বিচ্ছেদের সঠিক কারণই বা কী? — এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে রাজাগোপাল চট্টোপাধ্যায় 'উৎস মানুষ' পত্রিকায় প্রকাশিত (জানুয়ারি-মার্চ ২০১৭) 'রামকৃষ্ণ মিশন ও ব্রহ্মচারিণী নিবেদিতা' নামক নিবন্ধে যেভাবে বিভিন্ন বিশ্লেষণের উদ্ধৃতির সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন ও নিজের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তা থেকে একথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে লেখক পাঠকদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন যে নিবেদিতা বিপ্লবী ছিলেন না এবং তাঁর সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের বিরোধে কোনও রাজনৈতিক কারণ নিহিত ছিল না। লেখকের এই প্রচেষ্টা নিন্দার্হ কারণ বিশ্লেষকদের মতামত যদি নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করা যায় এবং নিবেদিতার সময়কার রাজনৈতিক ঘটনাবলী গভীরভাবে নিরীক্ষণ করা যায় তাহলে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হব যে লেখক অবৈজ্ঞানিকসুলভ মনোভাবের বশবর্তী হয়ে নিবেদিতার বিপ্লবী চরিত্র কলঙ্কিত করতে চেয়েছেন এবং নিবেদিতার সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পর্কের অপব্যাখ্যা করেছেন।

প্রথমে লেখকের নিবন্ধের দিকে নজর করা যাক।

লেখক স্বামী গম্ভীরানন্দের বক্তব্য লেখার শুরুতে তুলে ধরেছেন। গম্ভীরানন্দ বলেছেন, নিবেদিতা বিপ্লবী ছিলেন না কারণ তিনি বিপ্লবীদের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন নি। নীতিগত সহানুভূতি থাকলেই বিপ্লবী হওয়া যায় না। লেখক প্রীতিতোষ রায়ের বক্তব্য তুলে ধরে বলেন যে প্রীতিতোষবাবু নিবেদিতাকে বিপ্লবী হিসেবে দেখেন নি। তাঁর মতে, নিবেদিতা ১৯০৭ থেকে ১৯০৯ সালে যখন বিপ্লবী কর্মকাণ্ড তুঙ্গে তখন বিদেশে। তিনি এই বক্তব্য রাখেন যে, নিবেদিতা আইরিশ বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না।

একই সাথে লেখক যদিও উল্লেখ করেন যে, লিজেল রেমোঁ নিবেদিতাকে বিপ্লবী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, দেবজ্যোতি বর্মণ ও শঙ্করীপ্রসাদ বসু ছিলেন রেমোঁর অনুগামী কিন্তু লেখক একথা বলতে ভোলেন নি যে, রেমোঁ ১৯০১ সালে নিবেদিতার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের যে উল্লেখ করেন তাকে প্রীতিতোষবাবু মিথ্যাচার বলে চিত্রিত করেন।

নিবেদিতার সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পর্কের কথা আলোচনা করতে গিয়ে লেখক বলেন যে, স্বামী গম্ভীরানন্দের মতে, নিবেদিতার রাজনীতি ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগটাই তাঁর সঙ্গে মিশনের বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিল। কিন্তু লেখক একই সঙ্গে মন্তব্য করেন যে, প্রীতিতোষ রায় রাজনীতির সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কের কারণে মিশনের সঙ্গে বিরোধের ধারণার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, নিবেদিতা রাজনৈতিক অভিমত প্রকাশ করলেও তাঁকে রাজনীতিক বলা যায় না। স্বামী অভেদানন্দ, বিজ্ঞানানন্দ ও প্রভবানন্দ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পক্ষে বিবৃতি বা কাজকর্ম করে থাকলেও সেই কারণে তাঁদের মিশন-বহির্ভূত করা হয় নি।

লেখকের আলোচনা যেভাবে নিবেদিতার অবৈপ্লবিক চরিত্রের প্রবক্তারা গুরুত্ব পেয়েছেন এবং যেভাবে তাঁর বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড লেখকের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে তাতে একথা বলা যায় যে, লেখক নিবেদিতাকে বিপ্লবী হিসাবে চিহ্নিত করতে মোটেই আগ্রহী নন।

আর একটি প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়ায় ঃ নিবেদিতার সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের কী ধরনের বিচ্ছেদ হয়েছিল?

লেখকের মতে, ১৯৩২ সালে গুরুভাইরা ঠিকই বুঝেছিলেন যে, নিবেদিতা যতটা না asset , তার চেয়ে liability অধিক। তাঁকে খানিক দূরে ঠেলে দিলে নারীঘটিত কলঙ্কাদি থেকেও অনেকটা নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। তিনি আরো বলেন, একটা কথা হয়ত প্রীতিতোষ রায় ঠিকই অনুমান করেছেন, নিবেদিতার দূরে সরে যাওয়ার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর গুরুভাইদের কর্মধারা নিয়ে বিরোধের একটা অন্য প্রকাশ। লেখক নিবেদিতার রাজনীতির সঙ্গে সংযোগকে কখনই তাঁর রামকৃষ্ণ মিশনের বিচ্ছেদের কারণ হিসাবে দেখাতে চান নি।

এখন আমরা দেখব বিভিন্ন বিশ্লেষকের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে ও নিবেদিতার সময়কার বিভিন্ন ঘটনার

প্রেক্ষাপটে আমরা লেখকের মতামতকে কতখানি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করব?

কিছু চিন্তাবিদ এই মত পোষণ করেন যে নিবেদিতা বিপ্লবী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। কিন্তু অন্য কিছু চিন্তাবিদ এই আন্দোলনে নিবেদিতার সক্রিয় ভূমিকার উপর জোর দেন। ব্রহ্মচারী অরূপ চৈতন্য লেখেন, নিবেদিতা বিপ্লবী আন্দোলনে কখনই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন নি।[১] কিন্তু শ্রী অরবিন্দ যে বিবরণ দেন তাতে কোনো সংশয়ই থাকে না যে, নিদেনপক্ষে এক সংকটের মুহূর্তে নিবেদিতা গোপন বিপ্লবী ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন।

শ্রী অরবিন্দ লেখেন, নিবেদিতা মনে করতেন যে, শ্রী অরবিন্দ একজন শক্তির উপাসক। তাঁরই মতো বিপ্লবী দলের অন্তর্ভুক্ত। তিনি আরো বলেন, এক মহারাজার সঙ্গে নিবেদিতার সাক্ষাৎকারের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। এই সাক্ষাৎকারের সময় নিবেদিতা মহারাজাকে গোপন বিপ্লব সমর্থনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। নিবেদিতা মহারাজাকে বলেন যে, তিনি শ্রী অরবিন্দের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারেন।[২]

শ্রী অরবিন্দ অন্যত্র আবার লেখেন যে, তিনি অনুগতদের মাধ্যমে বাংলায় বৈপ্লবিক কাজকর্ম শুরু করার পর পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য বাংলাদেশে আসেন। তিনি দেখেন যে বাংলাদেশে ছোট ছোট বিপ্লবী গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে, কিন্তু এই গোষ্ঠীগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে কাজ করছে। তিনি এই গোষ্ঠীগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সচেষ্ট হন। তিনি বাংলায় ব্যারিস্টার পি মিত্রের নেতৃত্বে পাঁচজনের একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠন করেন। এই পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন নিবেদিতা। শ্রী অরবিন্দ গণ-আন্দোলনের অন্যতম নেতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগ ছিল কেবলমাত্র গোপন বৈপ্লবিক ক্ষেত্রে। পরবর্তী সময়ে তিনি মাঝে মাঝে সময় করে নিবেদিতার সঙ্গে বাগবাজারে দেখা করতে যেতেন।[৩]

একইভাবে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন যে, বাংলাদেশে বৈপ্লবিক দল স্থাপনের সময় থেকে স্বামীজীর শিষ্যা সিস্টার নিবেদিতা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং প্রশাসনিক কমিটির সদস্য পদ গ্রহণ করেন।[৪]

এই আলোচনার উপর নির্ভর করে আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে পারি যে ইতিহাসের এক পর্যায়ে নিবেদিতা প্রত্যক্ষভাবে বৈপ্লবিক আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। নিবেদিতার প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর আলোকপাত করেন সাধু রঙ্গরাজন। তিনি বলেন যে, ১৯০২ সালের ২০ অক্টোবর নিবেদিতা বরোদা পৌঁছান ও শ্রী অরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ধর্ম বা বিবেকানন্দর দর্শন তাঁদের আলোচনার বিষয় ছিল না। তাঁদের আলোচনার বিষয় ছিল বাংলার রাজনৈতিক ওঠাপড়া। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী ও বৈপ্লবিক গোষ্ঠীগুলির কার্যকরী নেতৃত্ব দেওয়ার স্বার্থে নিবেদিতা শ্রী অরবিন্দর কলকাতা পৌঁছনোর প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।[৫] রঙ্গরাজন-এর কথায়, নিবেদিতার বাসস্থানটি ছিল বিজ্ঞানী, শিল্পী, সাংবাদিক, জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবীদের মিলনক্ষেত্র। নিবেদিতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে যুবকেরা তাঁর বাড়িতে প্রত্যেক রবিবার মিলিত হতেন। এই যুবকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিখ্যাত বিপ্লবী ও অরবিন্দর ছোটভাই বারীন্দ্র ঘোষ।[৬]

১৯০২ সালে লর্ড কার্জন যখন জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার শ্বাসরোধ করতে 'ইউনিভার্সিটি কমিশন' নিয়োগ করেন তখন নিবেদিতা এই পদক্ষেপ্রে বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। যখন শ্রী অরবিন্দ পাঁচ সদস্যের বিপ্লবী কমিটি গঠন করেন নিবেদিতা কমিটির সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। তিনি এই ছাতার নীচে বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবী সংগঠনকে সংঘবদ্ধ করতে সচেষ্ট হন। পরবর্তী সময়ে এই বিপ্লবী কমিটিটি গোপন বৈপ্লবিক সংগঠন অনুশীলন সমিতির সঙ্গে মিশে যায়। এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত বিপ্লবী যুবকদের কাছে উৎসাহ ও পরামর্শদানের উৎস হয়ে ওঠেন সিস্টার নিবেদিতা। ১৯০৫ সালে নিবেদিতা বড় বড় সভায় ভাষণ দেন। এরকম একটি সভায় ব্রিটিশ সরকারের বাংলা বিভাগের পদক্ষেপের নিন্দা করে বীর বিপ্লবী আনন্দ মোহন বসু যে প্রস্তাব উপস্থাপন করেন তা তিনি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন।

অরবিন্দ, তাঁর ছোটভাই বারীন্দ্র ঘোষ ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯০৬ সালের ১২ মার্চ থেকে গোপন বৈপ্লবিক আন্দোলনের মুখপত্র হিসাবে যুগান্তর নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেন। নিবেদিতার বাড়িতেই এ পত্রিকা বের করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং তাঁর প্রচেষ্টায় এ পত্রিকার প্রচার সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০ হাজার কপির উপরে।

১৯০৭ সালের ২০ জুলাই যখন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত কারারুদ্ধ হন নিবেদিতা তাঁর সঙ্গে আদালতে সাক্ষাৎ করেন, তাঁর মায়ের যত্ন নেওয়া ও যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে তাঁকে আশ্বস্ত করেন এবং তাঁর ওপর ১০ হাজার টাকার যে জরিমানা ধার্য করা হয় তা সংগ্রহ করতে সাহায্য করেন।

১৯০৭ সালে নিবেদিতা ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। তাঁর লক্ষ্য

ছিল সভা-সমিতি, ব্রিটিশ সাংসদদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও পত্রপত্রিকায় লেখার মাধ্যমে ভারতীয় স্বাধীনতার পক্ষে এক অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা। নিবেদিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল ভারতের বাইরে থেকে বিপ্লবী পত্রপত্রিকা প্রকাশ করা, ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাদের প্রচার করা ও বাইরের দেশের ভারতীয় বিপ্লবীদের সংঘবদ্ধ করা। ১৯০৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর নিবেদিতা ইংল্যান্ড ছেড়ে আমেরিকা যাত্রা করেন। সেখানে তিনি ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, তারকনাথ দত্ত ও নির্বাসিত অন্যান্য বিপ্লবীদের পুনর্বাসনের স্বার্থে অর্থ সংগ্রহ করতে থাকেন এবং তাঁর পরিকল্পনা ছিল ভারতবর্ষের ফরাসি অধিকৃত অঞ্চলে একটি বাড়ি ক্রয় করা যাতে এই সমস্ত বিপ্লবীদের বাসের ব্যবস্থা করা যায় এবং তাঁরা তাঁদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে পারেন। ১৯০৯ সালে আলিপুর বোমা মামলায় অরবিন্দ মুক্ত হন। এই মুক্তি উপলক্ষ্যে নিবেদিতা তাঁর বিদ্যালয়ে উৎসব পালন করেন। কিন্তু কর্মযোগিন পত্রিকায় তাঁর লেখার জন্য অরবিন্দ ব্রিটিশ সরকারের রোষানলে পড়েন। এই পরিস্থিতিতে ধর্ম ও কর্মযোগিন পত্রিকা দুটির দায়ত্বভার নিবেদিতার হাতে তুলে দিয়ে অরবিন্দ ফরাসি অধিকৃত অঞ্চল চন্দননগরে দেশত্যাগী হন।

১৯০৭ সালে ও তার পরবর্তী সময়ে তিনি দমদমেই থাকুন বা বাগবাজারেই থাকুন নিবেদিতার বাড়িটি হয়ে উঠেছিল পলায়নপর বিপ্লবীদের খাদ্য, অর্থ ও মানচিত্র সরবরাহের কেন্দ্রস্থল। মুরারিপুকুর রোড গবেষণাগারে বোমা তৈরির সঙ্গে নিবেদিতার নাম জড়িয়ে পড়ে। তিনি বারীন্দ্র ঘোষের সহযোগীদের ক্রমাগত সাহায্য করতে থাকেন।[৭]

উপরের আলোচনার উপর নির্ভর করে আমরা বলতে পারি যে, বাংলায় আলোড়ন সৃষ্টিকারী বৈপ্লবিক কাজকর্মের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে বিপ্লবীদের পরামর্শদাত্রী, উৎসাহদাত্রী ও সংরক্ষক হিসাবে কাজ করে নিবেদিতা বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে লেখক নিবেদিতার সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে কোনো রাজনৈতিক কারণ খুঁজে পান নি। লেখকের এই ধরনের অবস্থান একেবারেই পরিত্যাজ্য কারণ সঠিক বিশ্লেষণে নিবেদিতা-মিশনের বিচ্ছেদে রাজনীতি বা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত হয়। সঠিক বিশ্লেষণের প্রয়াসে সমাজতত্ত্ববিদ শমিত করের লেখা 'রামকৃষ্ণ মিশন থেকে নিবেদিতার বহিষ্কার' শীর্ষক নিবন্ধ থেকে কিছু অংশ তুলে ধরছি ঃ

'নিবেদিতার সঙ্গে বিবেকানন্দ এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন-এর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এক নিরপেক্ষ ও নির্মোহ দৃষ্টিকোণে বিচার করে দেখা প্রয়োজন। ...লন্ডনে যে বিবেকানন্দকে মার্গারেট দেখেন তিনি ছিলেন বিপ্লবমন্ত্রে উজ্জীবিত দেশপ্রেমিক বিবেকানন্দ। কিন্তু ১৮৯৮-এর ২৮ জানুয়ারি বজবজে পদার্পণের পর যে বিবেকানন্দকে পান তিনি রামকৃষ্ণ মিশন-এর বেলুড় মঠের প্রধান পরিচালক হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। যদিও ঐ সময় ব্রিটিশ পুলিশের চোখে রামকৃষ্ণ মিশন স্বদেশী বিপ্লবমনের উদ্দীপ্ত বিপ্লবীদের আখড়া বলে বিবেচিত হত, বিবেকানন্দ বেলুড় মঠ স্থাপিত হবার পর এমন কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়াতে চান নি যাতে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হাজার হাজার অনুগামী-অনুগামিনীদের কাছে এক ভিন্ন বার্তা পৌঁছায়। তাই তিনি নিজের হাতে গড়া এই প্রতিষ্ঠানটিকে রাজনীতির সংশ্রব থেকে যতদূর সম্ভব দূরে রাখতে চেয়েছিলেন। অবশ্য বিবেকানন্দর পাশাপাশি তুরীয়ানন্দ, প্রজ্ঞানন্দ ও অভেদানন্দের মতো সন্ন্যাসীরাও অতীতে প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লববাদী রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু বেলুড় মঠ স্থাপিত হবার পর তাঁদের মধ্যে যেন এক ভিন্ন সত্ত্বার আবির্ভাব ঘটে। বিবেকানন্দর প্রতি মার্গারেট এদেশে আসার পর যে রীতিমতো হতাশ হয়ে পড়েন তা বোঝা যায় যেভাবে তিনি নিজেকে রামকৃষ্ণ মিশন-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়তা দেখান। ...তিনি নিজেকে কখনও এই প্রতিষ্ঠানের শরিক বলে মেনে নিতে চান নি। ...তাহলে কি এমন কথা উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, তিনি এদেশে প্রধানত এসেছিলেন ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের তাগিদে? ...এদেশে এসে এক আপাদমস্তক ধর্মপ্রাণ বিবেকানন্দকে দেখে আশ্চর্য হয়ে যান। ...শুরু হয় বিবেকানন্দর প্রতি বিকর্ষণ। সঙ্গে সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে রামকৃষ্ণ মিশন-এরও। তাই তিনি বিবেকানন্দর নিষেধ উপেক্ষা করে তখন এসব বিপ্লববাদে উদ্দীপ্ত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সঙ্গে মেলামেশা শুরু করেন যাঁদের সম্পর্কে বিবেকানন্দর ছিল তীব্র আপত্তি। ...বিবেকানন্দ তাঁর শিষ্যার এই অগ্রাহ্যপূর্ণ আচরণে এতটাই বিমর্ষ ও ব্যথিত হয়ে পড়েন যে তিনি তাঁকে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে বহিষ্কারের মতো কঠোরতম সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এর অব্যবহিত পরই তাঁর জীবনাবসান হয়। তিনি বেঁচে থাকলে হয়ত এই বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচিত হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যু ইতিহাসকে এমনটি হওয়ার কোনো সুযোগ দিতে পারে নি। সমাপ্তি ঘটে

রামকৃষ্ণ মিশন-এর সঙ্গে নিবেদিতার প্রত্যক্ষ সম্পর্কেরও। ...”[৮]

উপরের আলোচনার উপর নির্ভর করে আমরা বলতে পারি যে অল্প কিছু বিশ্লেষকের একপেশে দৃষ্টিভঙ্গীর উপর অতিরিক্ত নির্ভরতার ফলে এবং নিবেদিতার সমসাময়িক ঘটনাবলী উপেক্ষা করার ফলে লেখক নিবেদিতার চরিত্রের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে ব্যর্থ হয়েছেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীবিহীন পর্যালোচনা নিবেদিতার সঠিক মূল্যায়নে কখনই প্রাসঙ্গিক হতে পারে না।

তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

তথ্যসূত্র গ্রন্থ

১। Biplab Ranjan Ghosh, *Sister Nivedita and The Indian Renaissance*, Progress Publishers, Kolkata, 2013, p.13.

২। ibid., p. 16.

৩। ibid.

৪। ibid., pp. 16-7.

৫। Sadhu Rangarajan, ‘Sister Nivedita, Dedicated Daughter of Mother India’, Arisa Bharat (Internet).

৬। ibid.

৭। Reymond Lizelle, *The Dedicated, A Biography of Nivedita*, John Day Company, New York, 1953, p. 336.

৮। ‘ফলা’, জানুয়ারি ২০১৭।

সম্পাদকীয় সংযোজন—

তপনবাবুর এই চিঠির উত্তর দিতে রাজি হননি লেখক রাজাগোপাল চট্টোপাধ্যায়। ওঁর বক্তব্য, উনি যা বলার লেখাতেই জানিয়ে দিয়েছেন। পত্রলেখক যে সব বই রেফারেন্স হিসাবে উল্লেখ করেছেন, তার একটি বই ছাড়া অন্য বই তাঁর পড়া। নিবেদিতাকে নিয়ে ভাবাবেগ যতটা কাজ করে, যুক্তি ততটা নয়, তাই এই চিঠির উত্তর দিলে ব্যক্তি-আক্রমণ হয়ে যাবে। এই তাঁর যুক্তি।

নিবেদিতা প্রসঙ্গে আমাদের মনে কিছু প্রশ্ন আছে, এ প্রসঙ্গে তা পেশ করি— নিজের দেশ ছেড়ে বিভুঁইয়ে এসে এমনিতেই যে কাজ নিবেদিতা করেছিলেন, তা নারীশিক্ষা প্রসারেই হোক বা সমাজসেবায়, তার জন্যই তিনি ভারতবাসীর মনের মণিকোঠায় চিরকালীন স্থান করে নিয়েছেন। এগুলোর চেয়েও তাঁকে বিপ্লবী হিসাবে দেখতে এবং দেখাতে আমাদের আগ্রহ দিন দিন বেড়ে চলেছে। বিস্তর বইপত্র, নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, হয়ে চলেছে। শুধু তিনিই নন, বিবেকানন্দ, এমনকি রামকৃষ্ণকেও রাজনৈতিক বিপ্লবী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্‌যোগ লক্ষণীয়। সম্প্রতি প্রকাশিত দেবাঞ্জন সেনগুপ্তের ‘শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলার মুক্তি আন্দোলন’ তারই নমুনা। এতে মনে হচ্ছে, ওঁরা যে বিষয় নিয়ে মেতে ছিলেন, তা বোধহয় যথেষ্ট ছিল না। ওঁদের মুকুটে বিপ্লবের পালক গুঁজে দিলে ‘এক্সট্রা মাইলেজ’ দেবে। যেমন আমরা বিদ্যাসাগরকে দিয়ে দামোদর পার করিয়েছি, রাতারাতি ব্যাকরণের উপক্রমণিকা লিখিয়েছি ইত্যাদি।

নিবেদিতা বিপ্লবী ছিলেন, না ছিলেন না, তার নিষ্পত্তি পণ্ডিতেরা করবেন। আমরা কিছু সংশয়ের কথা পেশ করব। কাজী নজরুল ইসলাম একবার ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ নামে একটি কবিতা লেখেন। তার দরুন ব্রিটিশ পুলিশ নিয়ে গিয়ে গারদে পুরে দিয়েছিল। নজরুল নামী কবি ছিলেন। তাঁর অন্য কবিতায়, গানে ঝাঁঝ বা উস্কানি ছিল বলে পুলিস ব্যবস্থা নিতেই পারে। নজরুলেরই স্নেহধন্য ছিলেন গীতিকার প্রণব রায়। কমরেড’ নামে একটি কবিতা লেখার অপরাধে অখ্যাত কবিকেও জেলে পোরা হয়। দুটোই নিরীহ নমুনা। সেখানে আমরা নিবেদিতা সম্পর্কে পড়ি, তিনি আয়ারল্যান্ডের বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিতই ছিলেন না, লন্ডনে বিদ্রোহীদের কেন্দ্র পরিচালনাও করেছেন। কলকাতায় অরবিন্দের উদ্যোগে স্থাপিত গোপন বিপ্লবী সংগঠনগুলির দায়িত্ব নিয়েছিলেন। গুপ্ত সমিতির যুবকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাদের ভয় কাটাতে হাতে পিস্তল নিয়ে খেলতেনও! এত সব কাণ্ডকারখানার কোনো খবর ব্রিটিশ পুলিস রাখত না! আইরিশদের জাতশত্রু ব্রিটিশরা তাঁর ওপর নজর রাখত, এমন দাবি বিভিন্ন লেখায় পাই। এতেই পুলিস কর্তব্য সেরেছে? কেন? কোথাও নিবেদিতাকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ বা সতর্ক করা হয়েছিল, এমন উল্লেখ দেখিনি। অথচ যারা সামান্য কারণেই কত লোককে হেনস্থা করেছে, ফাটকে পুরেছে তার ইয়ত্তা নেই। মেয়েদের রেয়াত করত বলেও শোনা যায় না। এখান থেকেই খটকা লাগে।

গবেষক- পণ্ডিতদের অরবিন্দ ঘোষ এবং বিভিন্ন লোকের লেখা উদ্ধৃত করতে দেখি, কাউকেই তৎকালীন পুলিশ রেকর্ড কী বলছে, পেশ করতে দেখি না। যেটা সবচেয়ে ভালভাবে সন্দেহ নিরসন করত। নিবেদিতাকে ছোট করার উদ্দেশ্য থেকে নয়, উত্তর খোঁজার প্রয়াস থেকেই প্রশ্নের অবতারণা।

উমা

বইমেলায় আমরা

৪১তম আন্তর্জাতিক বইমেলা এবারও মিলন মেলা মাঠে হল ২৫ জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭। ২৭৩ নম্বর স্টলটি উৎস মানুষকে দেওয়া হয়। এবারের স্টলের চেহারাটা ছিল একেবারেই আলাদা। 'কর্পোরেট লুক' বললে হয়ত ঠিক হবে। মস্ত বড় হলঘরের ভেতরে বিভিন্ন মাপের খোপ, বই রাখার তাক, চেয়ার, ছোট একটা টেবিল দিয়ে— যাকে বলে তৈরি স্টল। দরজার বালাই ছিল না। এতে করে অন্যান্যবারের মতো ডেকরেটরের সন্ধান করা, স্টল তৈরির তাগাদা দেওয়া এসব আনুষঙ্গিক ঝামেলা এড়ানো গিয়েছে। ধুলোর দাপটও ছিল কম। কিন্তু বইমেলায় বাতের তেল, চ্যবণপ্রাশ এ ধরনের সামগ্রী নিয়ে নানান গুরুর নামের স্টলগুলো দিব্যি বেচকেনা চালিয়ে গেল। হলের মেঝেতে সাপের ফণার মতো চাগিয়ে ওঠা কার্পেটে অনেকেই হোঁচট খেয়েছেন। হলের নাকের ডগায় বিভিন্ন প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, রান্নার ম্যাগাজিনের স্টলে কুইজ কনটেস্ট আয়োজন করে লোক জড়ো করা, মাইকের যথেচ্ছ ব্যবহার এসব ঠোকাবার কোনো উদ্যোগ চোখে পড়ে নি। এবারো যথারীতি বেড়াবার লোক বেশি — পাঠকের ভিড় তুলনামূলকভাবে অনেক কমই ছিল। সরকারি উদ্যোগে পানীয় জলের প্যাকেট বিতরণ করা হয়। মেলার মাঠের অপরিচ্ছন্নতা ছিল চোখে পড়ার মতো। কিন্তু একথাটা স্বীকার করতেই হবে যে, হাওড়া শিয়ালদহ হয়ে যেসব মানুষ গড়ের মাঠের মেলাতে আসতেন তাঁরা মিলন মেলার মাঠে আসছেন না বা বলা ভাল আসার ঝামেলা পোয়াতে চাইছেন না। এতে আমাদের মতো ছোটখাটো প্রকাশকদের বিক্রি মার খাচ্ছে। এই সমস্যাটার দিকে কিন্তু কারো নজর নেই।

বইমোলায় 'গুমোট ভাঙার গান' ২য় সংস্করণ ও 'বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ'-এর ৭ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। উৎস মানুষের স্টলে অনেক পুরনো বন্ধু এসে আমাদের উৎসাহ দিয়েছেন। আমরা কৃতজ্ঞ। এঁরাই পত্রিকাকে অক্সিজেন জুগিয়ে যাচ্ছেন।

এই এতবছর পরেও উৎস মানুষের ২০/৩০ বছর আগের বইয়ের চাহিদা এতটুকুও কমে নি। উৎস মানুষ-এর টানে নতুন বই-এর সন্ধানে পাঠক আমাদের স্টলে একবার ঢুঁ মারবেনই। এরকমটাও দেখি আমাদের বই আগে কিনেছেন অথচ কাউকে পড়তে দিয়ে ফেরত পান নি তাই আবারো কেনা। সুন্দরবনের কাছের গ্রামের এক স্কুলমাস্টার পত্রিকার গ্রাহক হলেন। আবার ভারি সুন্দর মন্তব্য করে গেলেন— 'আপনাদের পত্রিকার ভাষা এত সহজ সরল যে গ্রামের মানুষ অনায়াসে তা বুঝতে পারে। লেখাগুলোতে পণ্ডিতি ফলানোর চেষ্টা নেই' ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রশংসা শুনতে কার না ভাল লাগে। আমাদের দায়িত্ব বেড়ে গেল। এমন কথাও কানে গেল— 'এ ধরনের অনেক পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে, আপনারা কিন্তু survive করে আছেন।' এসব শুনলে উৎসাহ পাই।

১২ দিনের এই বইমেলা ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে দিয়ে শেষ হল ৫ ফেব্রুয়ারি। আগামী বইমেলার দিন ঘোষণা করা হল। মেলা চলবে ৩১ জানুয়ারি থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮। তবে সম্ভবত মিলনমেলার মাঠে নয়, হবে সেই-ই রাজারহাটে। মিলনমেলার মাঠেই অনেকে আসেন না তো রাজারহাটে! বইমেলার ঘণ্টার ধ্বনি আমাদের মৃত্যু ঘণ্টা বাজিয়ে দিল না তো?

প্রতিবেদক: বরুণ ভট্টাচার্য

শোক সংবাদ

উৎস মানুষের এক সময়ের অক্লান্ত কর্মী ও বন্ধু প্রভাস বিশ্বাস প্রয়াত হয়েছেন। এ রাজ্যে কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলনের প্রসারে নানান জায়গায় যেসব প্রদর্শনী হত তাতে প্রভাস নিয়মিত অংশ নিতেন। অনেকেই সে কথা মনে রেখেছেন। প্রভাসের অকালপ্রয়াণে আমরা শোকাহত।

উৎস মানুষ পত্রিকা পেতে যোগাযোগ করুন

সুমন্ত বিশ্বাস

২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন

কলকাতা - ৭০০০১২

(কলেজ স্ট্রীট কর্পোরেশন অফিসের পাশের গলি)

ফোন নং - ৯৪৩৩৭৭১৫৭৭/৯১৪৩৭৮৬১৩৪

উৎস মানুষ-এর সমস্ত বই-এর জন্য যোগাযোগ করুন

র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন

৪৩, বেনিয়াটোলা লেন।

কলকাতা -৭০০০০৯

ফোন - ২২৪১-৬৯৮৮

উৎস মানুষ পত্রিকার গ্রাহক হবার নিয়ম

বছরে ৪টি সংখ্যা। চাঁদা ডাক খরচ সহ ১২০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। UBI-এর যে কোনো শাখায় টাকা জমা দিন অথবা অন্য যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা জমা দিন UBI কলেজ স্ট্রীট শাখায়। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নীচে দেওয়া হল—

United Bank of India, College Street Branch, Kolkata - 700073. UTSA MANUSH, SB ACCOUNT NO. 0083010748838. IFSC NO. UTBI0COLI08

ফোন করে কিংবা ই-মেল করে আপনার ঠিকানা (পিনকোড ও ফোন নং সহ) এবং কোন মাস থেকে গ্রাহক হলেন অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। বইমেলার স্টলে গ্রাহক করা হয়। গ্রাহক নবীকরণ একইভাবে করা হয়। ডাকে পত্রিকা পাঠানো হবে।

ওয়েবসাইট : **www.utsamanush.com**

ই-মেল : **utsamanush1980@gmail.com**

পুস্তক তালিকা

বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (দুই খণ্ড একত্রে সংকলিত)	২০০.০০
গুমোট ভাঙ্গার গান	১৫০.০০
নিজের মুখোমুখি	৫০.০০
বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ	১৫০.০০
প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ	৩০.০০
তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক	১৮.০০
বাংলা বন্ধ বা শেষের শুরু	৪০.০০
এটা কী ওটা কেন	৫০.০০
যে গল্পের শেষ নেই	৫০.০০
আরজ আলী মাতুব্বর	২০.০০
প্রতিরোধযুদ্ধ অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে	৬০.০০
বিবেকানন্দ অন্য চোখে/ সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক	১০০.০০
শেকল ভাঙা সংস্কৃতি	৬০.০০
প্রমিথিউসের পথে	৪০.০০
লেখালিখি	২০০.০০
যুক্তিবাদের চার সেনাপতি	৪০.০০
মূল্যবোধ	৫০.০০

প্রাপ্তিস্থানযুদ্ধ বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), ধ্যানবিন্দু (কলেজ স্ট্রীট), থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোজ, কলকাতা-২৬, ক্রান্তিক (কলেজ স্ট্রীট), বুক মার্ক (কলেজ স্ট্রীট), ডাঃ শান্তিরঞ্জন মল্লিকের চেম্বার— কোন্নগর।